# তরুণ তুর্কী

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

পর্য্যটক প্রকাশনা ভবন
১৫৬নং আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

# তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

তরুণ তুর্কী তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। কাগজের অভাবে জায়গার অপচয় না ক'রে ছাপা হয়েছে। বিষয়বস্তু মোটেই কমান হয়নি, বরং বাড়ান হয়েছে। যাঁরা মোটা বই কিনতে অভ্যস্ত তাঁদের কাছে বইখানা বড়ই ছোট হয়ে গেল। মানুষের অভ্যাস বদলায়, অতএব ভয় করবার কিছুই নাই। তরুণ তুর্কী প্রথম এবং দ্বিতীয় সংস্করণের মতই তৃতীয় সংস্করণও আদৃত হবে এই আমার সুদৃঢ় ধারণা।

গ্রন্থকার

# তরুণ তুর্কী

## তুর্কী-সীমান্তের পথে

ভারতের সীমানা পার হতে হলেই পর্যটনকারীর সামনে বড় সমস্যা হয় ছাড়পত্র এবং ভিসা সংগ্রহ করা। ভিসা ছাড়পত্রেরই অনুরূপ। এতে ভ্রমণের অভিপ্রায়, ধর্মমত ইত্যাদি লিখিত থাকে। ভিসা সংগ্রহের হাংগামটা বিরক্তিকর তো বটেই, তা ছাড়া একটু এদিক সেদিক হলে অনেক সময় মেলাও কঠিন। তাই বাগদাদ থেকেই ঠিক করে নিয়েছিলাম যে, তুর্কীর ভিসা ইরানের রাজধানী তেহরান হতেই জোগাড় করে রাখব। কিন্তু তেহরানে পৌঁছে লোকের মুখে যা শুনলাম, তাতে মনটা বড় দমে গেল। তুর্কী প্রবেশের ভিসা পাওয়া নাকি দুষ্কর। এমন কি শতকরা নব্বই জনই পায় না। তাছাড়া ভারতবাসীদের নাকি তুর্কীর কনসাল আদৌ পছন্দ করেন না। অনেক ভেবে চিন্তে একটু এগিয়ে গিয়ে আলেপ্পোতে তুর্কীর ভিসা জোগাড় করব মনস্থ করলাম।

একদিন এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। তেহরান ত্যাগের পূর্বে তেহরান শহরে অনেকদিন অনির্দিষ্ট ভাবে বেড়িয়েছি। সেদিনও ঠিক সেই রকম পথে পথে বেড়াচ্ছিলাম। অনেকক্ষণ বেড়াবার পর 'সরায়ে হিন্দ'-এর দিকে ফিরলাম। এমন সময় একজন আর্মেনী যুবক নমস্কার জানিয়ে পরিষ্কার ইংলিশে প্রশ্ন করল, সংবাদপত্রে সাইকেলে পৃথিবী-পর্যটন-প্রয়াসী যে একজন হিন্দুর নাম বেরিয়েছে, আপনি কি তিনি? বাইসাইকেলের উপর থেকেই উত্তর দিলাম, হ্যাঁ। যুবকটি আগ্রহভরে বল্‌ল, যদি কিছু মনে না করেন, তবে এই পাশের কাফেতে চলুন, আপনার সংগে আলাপ করে ধন্য হই।

এরূপ আলাপ করবার লোক বিদেশে অনেক পাওয়া যায়। চীনদেশে ভ্রমণকালে এরকম অনেক লোকের সংগে দেখা হয়েছিল। তারা কেউ মরণের জন্য ব্যগ্র হয়ে আমার মত পথিকের কাছেও মরণের ঔষধ চেয়ে বসত, আবার কেউ বা যাতে আমার মরণ হয় তার সুযোগও খুঁজে বেড়াত। তারাও ঠিক এমনি করে আমার সংগে আলাপ করে ধন্য হবে বলত। এই আর্মেনী যুবকটি কি সেই রকমেরই লোক? আশা ও সংশয়ে মনটা দুলে উঠল। প্রকাশ্যে বললাম, আপনার কি প্রয়োজন জানতে পারি কি? সবিনয়ে তরুণটি বলল, অনেক দিন থেকেই আমার এরূপ ভ্রমণের ইচ্ছা, তাই আপনার ভ্রমণকাহিনী শুনতে বড় কৌতূহলী হয়েছি।

সন্দেহ গেল না। সাইকেল থেকে নেমে তার সংগে কাফেতে গিয়ে আরাম করে বসলাম। তরুণ দু পেয়ালা চাএর আদেশ দিয়ে আমাকে একটি সিগারেট দিল এবং নিজেও একটি ধরাল। যে যে দেশ ভ্রমণ করেছিলাম সেইসব দেশের ভ্রমণ-কথা সংখেপে তাকে বললাম। লখ্য করলাম, যুবক নিবিষ্ট-চিত্তে আমার কথা শুনছে। কথায় কথায় বললাম, আমি সত্বরই তুর্কী যাব। কিন্তু ভিসা এখনও পাই নি।

সে একটু চিন্তিত হয়ে বলল, হ্যাঁ, আজকাল তুর্কীতে প্রবেশ করা একটু কষ্টকর বটে, তবে ধর্মের গোঁড়ামিটা যদি ছেড়ে দেন, তবে ভিসা পেতে মোটেই সময় লাগবে না। আবার জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, আপনি কোন্ দেবতার ভজনা করেন?

আমাদের দেশের অসংখ্য দেববিগ্রহ আর্মেনী যুবকের কাছে অপরিচিত। আমার কথাবার্তা শুনে সে যখন বুঝল যে আমি হজরত মহম্মদের ভক্ত সত্যিই নই, তখন সে লাফিয়ে উঠে বলল, তুর্কীর ভিসা পেতে আপনার কোনই কষ্ট হবে না। যুবকের কথায় প্রাণে যেন প্রাণ ফিরে এল।

খাওয়া শেষ করে আমরা কাফে থেকে বেরিয়ে পড়লাম। যুবকটি আমাকে তুর্কী কনসালের বাড়ীর দিকে নিয়ে চলল। পথে তার সংগে নানারকম কথা হতে লাগল। আলাপে বুঝলাম, যুবকের মতিগতি বর্তমান যুগের নয়, সে ভবিষ্যতের বর্তমান। বিদায়ের বেলা সে আমাকে বলল, যদি সময় করে উঠতে পারে, তবে সে 'সরায়ে হিন্দ'-এ গিয়ে দেখা করবে।

তাকে বিদায় দিয়ে আমি তুর্কীর কনসালের দরজায় এসে দাঁড়ালাম। দুজন

লোক—পিয়নই বলি, আর দারোয়ানই বলি, দরজার দুপাশে বসেছিল। একজন এসে ফরাসী ভাষায় কি বলতে লাগল। আমি হিন্দীতে বললাম, এই আমার পাসপোর্ট, তুর্কীর ভিসার জন্য এসেছি। এখানা নিয়ে যাও। পাসপোর্টখানা হাতে নিয়ে একটু দেখেই সে আমাকে ফেরত দিল। বুঝলাম, লোকটা আমার কথা বুঝতে পারে নি। তারপর একখানা কাগজে আমার আসার উদ্দেশ্য ইংলিশে লিখে তাকে দিলাম। সে কাগজখানা নিয়ে উপরে গেল। একটু পরেই লোকটা নীচে এসে ইংগিতে বুঝিয়ে দিলে যে আমার কাগজখানা কনসালকে দিয়ে এসেছে।

বসে আছি তো বসেই আছি। শ্রান্তিতে চোখের পাতা বুজে আসছে। হঠাৎ জুতার খট খট শব্দে তন্দ্রা ভেংগে গেল। চেয়ে দেখি দুজন ভদ্রলোক ইংলিশ কথা বলতে বলতে ঘরে প্রবেশ করছেন। সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের আমার আসার কারণ জানিয়ে সবিনয়ে বললাম, আমি এখানে ভিসা পাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। দয়া করে যদি সাহায্য করেন তবে একান্ত বাধিত হব।

দেখি কি করতে পারি, বলেই তারা সটান উপরে চলে গেলেন। একটু পরেই ডাক এল। ভিতরে গেলাম। আমার রীতি হল নমস্কার করা। বিদেশে আমি গুড মর্নিং বলি না পাছে কেউ আমাকে ফিরিংগি বলে ভুল বোঝে, আদাব বলি না পাছে কেউ আমাকে ইরানী বলে ভাবে, সেলাম বলি না, আরব বলে সন্দেহ করতে পারে। আমার দেশের, আমার জাতের মৌলিকত্ব বজায় থাকে শুধু নমস্কারে। আমার নমস্কার কথাটা শুনেই যেন কনসালের চমক ভাংল। তিনি পাসপোর্ট খানা ভাল করে দেখে যে কি বললেন তা আমি বুঝলাম না। তারপর ইংলিশে অপর ভদ্রলোক আমায় বললেন, সিলেট কোথায় মশাই ? আমি বললাম, পূর্ব বংগে।

—আপনাদের দেশের লোক সবই নাকি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ?

—কে বললে ? মুসলমান ধর্মাবলম্বীও তো আছে।

—তবে আপনি মুসলমান নন বলেই মনে হয়, সত্যি নয় কি ?

ঘাড় নেড়ে বললাম, হ্যাঁ, তাই, আপনার অনুমানই ঠিক।

—কিন্তু আমি কি করে বুঝব আপনি মুসলমান নন ?

প্রমাণ আর কি দেব ? দেশে লিখলেই জানতে পারবেন, অথবা স্থানীয়

হিন্দুদের * ডেকে পাঠাতে পারেন। এছাড়া আমি যে মুসলম্যান ধর্মাবলম্বী নই, তার আরও একটি প্রমাণ আছে। ভদ্রলোক আমার শেষের কথাটি শুনে খুব একচোট হেসে নিয়ে কনসালকে আমার সব কথাই বুঝিয়ে দিলেন। কনসাল ড্রয়ার থেকে স্ট্যাম্প বার করে পাসপোর্টে ভিসার সীল মেরে দিলেন। দোভাষী ভদ্রলোক আমার হাতে পাসপোর্ট খানা দিয়ে বললেন, ভিসা দেওয়া হয়েছে। রাস্তায় আলেপ্পোতে আর একজন কনসাল আছেন। তাঁর সংগেও দেখা করে যাবেন, যদি ভিসা শেষ হয়ে যায়, তবে তিনি নতুন ভিসা দিয়ে দেবেন। আরও বললেন, তুর্কীতে গিয়ে অনেক কিছু নতুন দেখবেন, ভারতে ফিরে গিয়ে তুর্কীর নতুনত্ব ভারতের লোকের কাছে বলবেন। ঐ ভদ্রলোক এবং কনসালকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বিদায় নিলাম। যে সব ভারতী তুর্কীর ভিসা পাব না বলে নিরাশ করতে চেয়েছিলেন, ভিসা পেয়েছি শুনে তাঁরা সবাই আশ্চর্যান্বিত হলেন।

তুর্কীর ভিসা পেয়ে মনটা উৎফুল্ল হল। ক্রমে বাগদাদ দামস্কাস ইত্যাদি বড় বড় শহর ভ্রমণ করে আলেপ্পোতে গিয়ে হাজির হলাম। সেখানকার কনসাল আমার পাসপোর্ট দেখে একখানা চিঠি দিয়ে বললেন, দুসপ্তাহের মধ্যেই আমার তুর্কীতে পৌছনো চাই, নইলে তুর্কীতে প্রবেশ করতে পারব না। বেশ বুঝলাম, তাঁর নিজের ভিসা দেবার কোনো ক্ষমতা নেই বলেই এরূপ বললেন। আলেপ্পোতে এবং তার উত্তরাঞ্চলে বেশীদিন না কাটিয়ে তাড়াতাড়ি আলেকজেন্দ্রেতায় গিয়ে হাজির হলাম। পথে এই অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক তথ্য সংগ্রহ করে নিয়েছি। তাই ঐ অন্চলে বেশী দিন থাকতে পারি নি বলে মনে কোন ক্ষোভ হয় নি।

আলেক্জেন্দ্রেতা সিরিয়ার শেষ সীমা। আর কুড়ি কিলোমিটার গেলেই তুর্কী রাজ্যের সীমানায় পা দিতে হবে। ছোট শহরটিতে ১২ ফ্র্যাংক দিয়ে একটি বিছানা ভাড়া করে প্রথম রাত্রি কাটিয়ে পরদিন বৃটিশ কনসালের সংগে দেখা করলাম। তিনি বললেন ভিসা ঠিকই আছে। তবে কিনা, পুনা-লণ্ডন যাত্রীদের সংবাদ বোধ হয় অবগত আছেন। তবুও আমি আমার সাধ্যমত সাহায্য করতে ত্রুটি করব না। বলুন কি করতে পারি ?

* তুরুকরা হিন্দু বলতে ভারতবাসীই বোঝে।

আমি সে সংবাদ জানতাম। পুনা হতে কএকজন যুবক লণ্ডন যান, তাদের তুর্কী সীমান্ত হতে দুবার ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি বললাম, ভিসা তো ঠিকই আছে। তারপর আলেপ্পো থেকেও তুর্কী কনসালের একখানি পত্র এনেছি। আর তো কিছুর দরকার দেখি না। কনসাল প্রশ্ন করলেন, বাইসাইকেলের ত্রিপ্‌টিক ( ট্রিপ্‌টিকেট ) আছে কি না। আমি বললাম, ত্রিপ্‌টিক তো মশাই জানতাম না, জানলে অবশ্যই আনতাম। তিনি আবার বললেন, যদি তুর্কীর সীমান্ত হতে ফিরে আসতে হয়, তবে তাঁর সংগে আবার যেন দেখা করি। আমার তুর্কী প্রবেশের জন্য তখন তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। কিন্তু ত্রিপ্‌টিক কথাটার অর্থ আমাকে বলে দেন নি।

কনসালের বাড়ি হতে ফিরে আসার পর হোটেলে একটি ফরাসী গুপ্ত পুলিশের সংগে দেখা হল। সে বেশ ইংলিশ বলতে পারত। পুনা-লণ্ডন যাত্রীদের সংবাদ জিগ্‌গাসা করে জানলাম পুনা থেকে যারা এসেছিলেন, তাঁরা দুবার সিরিয়ার সীমান্ত থেকে ফিরে আসেন। কিসের জন্যে তাঁদের ফিরে আসতে হয়েছিল, গোয়েন্দা তার কিছুই জানে না। ত্রিপ্‌টিক সম্বন্ধেও তার কোন ধারণা নাই বলে মনে হল।

হোটেল থেকে বেরিয়ে কতকগুলি যুবকের সংগে দেখা হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের সংগে আলাপ জমিয়ে নিলাম। ওরা জাতে আর্মেনী। মামুলী ইংলিশ বলতে পারে। ব্যবসা জুতা সাফ করা। তাদের কাছ থেকেও জানবার মত কোনও সংবাদ পাই নি। তাই আর বেশী ঘোরাঘুরি না করে বিকালে সমুদ্রতীরে বেড়াবার উদ্দেশ্যে হোটেলে ফিরে এলাম।

সমুদ্রতীরে ভ্রমণ মনে একটা পরিবর্তন এনে দেয়। তবে মনের পরিবর্তনের জন্য আমি সমুদ্রতীরে বেড়াতে যাই নি। আমি গিয়েছিলাম সমুদ্রতীরে লোকসমাগম দেখতে, লোক-চরিত্র পাঠ করতে। সমুদ্রতীর অনেক দেখেছি, কিন্তু এমন সুন্দর সমুদ্রতীর বড় একটা দেখি নি। সামনে দিগন্তশায়িত ভূমধ্যসাগর—নীরব, নিস্তব্ধ। মৃদুমন্দ বাতাসে লীলায়িত তরংগ সমুদ্রে উঠে সমুদ্রের বুকেই মিলিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রতীরে তার কোন ঘাত-প্রতিঘাত নেই। সমুদ্রতীর প্রশস্ত এবং পরিষ্কার, তারই মাঝে সুন্দর পথের দুপাশে সারি সারি বৃক্ষ। সেই বৃক্ষরাজির সৌন্দর্য নয়নাভিরাম।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে তাই দেখলাম। মনে মনে ভাবলাম, যারা এরূপ বৃক্ষ

রোপণ করে সমুদ্রতীরের সৌন্দর্য গড়ে তুলেছে, তাদের নিশ্চয়ই শিল্প-কলার সূক্ষ্মজ্ঞান আছে। পথের সৌন্দর্য, বৃক্ষরাজির সৌন্দর্য এবং পাশের সাজানো গুলজার কাফেখানাগুলির সৌন্দর্য দেখে মনে এক অদ্ভুত আনন্দ জাগল। সেই অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে মানবতা এবং হৃদয়ের উদারতার স্বাদ ছিল।

কাফেগুলি আরব ধরনের। কিন্তু যারা কাফি খেতে এসেছেন, তাদের কারও পোশাকপরিচ্ছদ আরব ধরনের নয়। কেউ আরবী ভাষা বলছে না। কাফেখানাগুলি যেন আরবী ভাষাকে বর্জন করেছে। আরব ছাড়া সকল জাতের লোকই উপস্থিত বললে দোষ হয় না, অথবা যে সকল আরব সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তারা সকলেই ইউরোপীয় পোশাকে সজ্জিত। আমি তো সেখানকার লোক নই যে, এক নিমেষে কে কোন্ জাতের লোক বুঝে নেব।

সর্বসাধারণের সংগে মিশবার আমার একটি মাত্র উপায় ছিল। সেটি হল ভিক্ষার পরওয়ানা নিয়ে হাজির হওয়া। হাজিরও হয়েছিলাম। দেখেছিলাম সেখানে আরবও আছে এবং তাদের হৃদয়েও জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা আছে। অনেকে ক্ষুণ্ণমনে আমাকে বলেছিলেন, কেন আপনার ভিক্ষার পরওয়ানা আরবী ভাষায় ছাপালেন না? ইহুদী, আর্মেনী, ফরাসী, তুরুক সব ভাষাই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আরবী ভাষা কি দোষ করেছে?

আমি পড়লাম উভয়-সংকটে। কারণ ওরা ছাড়া আর কেউই আরব ভাষার পক্ষপাতী নয়। আর কিছু না হোক, বুঝতে পারলাম, জাতীয়তার সংকীর্ণতা এই ছোট শহরটির আবহাওয়া বিষময় করে তুলেছে।

আর্মেনীরা কিন্তু নীরব। তারা সাতেও নেই পাঁচেও নেই। তারা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল তাদের অন্তরের ব্যথা। অনেকবার তাদের দেশে তুরুকগণ নরহত্যার তাণ্ডব-নৃত্য দেখিয়েছে। বর্তমানে আর্মেনিয়ার যে অংশটা তুরুকদের হাতে আছে, সেখানে একজনও আর্মেনী নেই। তাদের অনেককে মেরে ফেলা হয়েছে, অনেককে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, আবার অনেকে পালিয়ে এসেছে। যারা পালিয়ে এসেছে, তাদেরই বংশধরগণ এসকল স্থানে বসবাস করছে। আর্মেনী অন্তরের সহিত উপলব্ধি করতে পেরেছে যে মানব-সমাজের কত বড় ক্ষতি করতে পারে এই জাতীয়ভাব। তাই তাদের মাঝে অনেকে নতুন মতের পক্ষপাতী। তারা প্রকাশ্যে এখন বলে বেড়ায়, যদি তুরুকদের সংগে রুশদের কোন রকম মনোমালিন্য ঘটে তবেই তাদের

মংগল তবেই তারা খুশী। কারণ এতে তারা নিজের দেশে ফিরে যেতে পারবে। তারা ভগবানকে চায় না। তারা অপরিচিত কাউকে তোয়াজ করে নিজের পেট ভরাতে চায় না। তারা প্রথমে শুধু চায় নিজের মাতৃভূমিতে ফিরে যাওয়ার অধিকার। তারা চায় বসবাসের জন্যে ঘর, চায করবার জমি, আর পরিশ্রমের দরুণ মজুরি এবং ন্যায্য মর্যাদা। তাদের অন্তরের ব্যথা আমার চোখের সামনে ছায়াছবির মত ভেসে উঠেছিল। দুঃখ পেয়েছিলাম এই ভেবে যে, এই দুর্ভাগা মানুষগুলির জন্য কোন কিছুই আমার করবার নেই। এই না-পারার দুঃখে হৃদয়ে অপরিসীম জ্বালা অনুভব করেছিলাম। তখন ভাবলাম, আমি কে? কিই বা করতে পারি আমি। পরিচয় আমার নিতান্তই ক্ষুদ্র, আমি বিশ্বসংসারে একজন ভবঘুরে মাত্র। তাই একান্ত নিরুপায়ের মত মনের দুঃখ চেপে ব্যথিত-চিত্তে সে দিন সমুদ্রতীর থেকে ফিরে গেলাম।

# আদানার পথে

পরদিন প্রাতে সাতটার সময় লজিং হতে রওনা হয়ে শহরের শেষ সীমায় পৌঁছলাম। রাস্তার এক পাশে সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে একটা কাফেতে প্রবেশ করে এক পেয়ালা কাফি এবং কএকখানা রুটি খেয়ে পথে এলাম। মনে মনে ভাবলাম, ফরাসী কাস্টমস্ অফিসের পাশ ঘেঁষে যাওয়াই ভাল, নইলে আবার তারা কোন বিপদের সৃষ্টি করে বসতে পারে। ফরাসী কাস্টমসের মত বড়ো কাস্টমস্ আজ পর্যন্ত দেখি নি। কাস্টমস্ অফিসের সামনেই কএকজন অফিসার বসেছিল। তারা আমার দিকে যেন তাকাতেই চায় না; কিন্তু এটা কি তাদের আমার প্রতি দয়া না উপহাস জানবার জন্য শেষটায় আমি নিজেই সাইকেল থেকে নেমে জিগ্গাসা করলাম, কি মশাই, আমার বোঝাটা পরীক্ষা করবেন না? একজন অফিসার বসে বসেই বললে, আপনি যে তুর্কী যাচ্ছেন তা আমাদের জানা আছে। সেজন্যই আর তল্লাসের প্রয়োজন বোধ করছি না। আমি বললাম, যারা তুর্কীতে যায়, তাদের বুঝি আপনারা তল্লাস করেন না? লোকটি জবাব দিল, যারা তুর্কীতে যায়, তারা এ রাস্তায় বড় একটা যায় না। আর একান্তই যদি এ রাস্তা দিয়ে যায়, তবে ফিরে আসে। তাই আর তল্লাস করার প্রয়োজন হয় না।

কথাটা শুনে যদিও দুঃখ হল, তবুও হেসে বললাম, মশাই, এ শর্মা কিন্তু ফিরে আসছে না।

লোকটি তেমনি হেসেই উত্তর দিল, এই কাফেতে আপনি খেয়েছেন দেখেছি। আমরা সেখানে ছিলাম না বলেই ভদ্রতা করতে পারি নি। যখন তুর্কীর সীমান্ত হতে ফিরে আসবেন, তখন আপনাকে এক পেয়ালা কাফি ভদ্রতার খাতিরে খাওয়াব।

সীমান্ত হতে যে ফিরে আসতে হবে, এ যেন দিনের আলোকের মত সুস্পষ্ট।

নমস্কার করে আমি বিদায় নিলাম। মাইল তিনেকের পরই রাস্তা একেবারে ভাংগা। অনেকদিন কেউ মেরামত করে নি। কোনকালে রাস্তা

যে খুব ভাল ছিল, তা দেখলেই বুঝা যায়। সীমান্তে রাস্তা যেরূপ হয়, এই রাস্তাটি তার চেয়েও খারাপ। এমন করে পথটিকে দুর্গম করে রাখবার কি কারণ থাকতে পারে, তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম, তুর্কী এবং সিরিয়ার সীমান্ত এখনও পাকাপাকি ভাবে ঠিক হয় নি। আমার এরকম খারাপ রাস্তায় চলে অভ্যাস আছে বলেই ঘাবড়ালাম না। সাইকেল হতে নেমে পায়ে হেঁটে চলতে লাগলাম। কারণ এত খারাপ রাস্তায় সাইকেল চালানো বড়ই মুশকিল। মাইল দশেক গিয়ে একটি গ্রাম নজরে পড়ল। লক্ষ্মীছাড়া পল্লী, একেবারে শ্রীহীন। অযত্নে ঘর বাড়ি ভেংগে পড়ছে। সেখানে লোকজন আছে, কিন্তু প্রাণ নেই। মুরগীগুলোও যেন ভয়ে ভয়ে ডাকছে। তারপর পাহাড়ের পর পাহাড়। রাস্তার দুধারে নিবিড় অরণ্য। একটা অজানা আশংকায় গা ছমছম করতে লাগল। চারদিকে যেন এক নিঝুম নিস্তব্ধতা অনুভব করা যায়। নিজেকে নিতান্ত অসহায় বলে মনে হচ্ছিল। মরণের ভয় নেই, শুধু ভাবছিলাম এই জঘন্য রাস্তার কথা। যদি পড়ে হাত পা ভাংগে তো কে দেখবে? আগের বৎসর চীন হতে ফিরবার পথে যখন গৌহাটী দিয়ে আসছিলাম, তখন শিলংএর লাইলংকট পাহাড় হতে পড়ে যাই। সংগী শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ দে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। এই দুর্গম পথে চলতে চলতে তার কথাই বার বার মনে পড়তে লাগল।

মাঝে মাঝে জীর্ণ সেতু। কাঠগুলোয় পচন ধরেছে। এপথে লোকজনের যে বেশী যাতায়াত নেই, এতেই তা প্রতীয়মান হয়। এগুলোর উপর দিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করলাম। কিন্তু একটি জনপ্রাণীও চোখে পড়ল না। পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।- সতৃষ্ণ নয়নে মানুষের আস্তানা খুঁজতে লাগলাম। তুর্কী সীমান্তের মাইল খানেকের ভিতরে একটা পুরানো কেল্লার সামনে একটি হালফ্যাসনের বাড়ি চোখে পড়ল। বাড়ির গায়েই কতকগুলি কাপড় ঝুলছে কিন্তু লোকজনের সাড়াশব্দ না পেয়ে পিপাসা নিয়েই এগিয়ে চলতে হল। তারপর আরও কতক্ষণ এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলাম, সাদা কাপড়ের উপর লাল চাঁদ ও তারা আঁকা একটা পতাকা উড়ছে। নব্য তুর্কী ও আরবের মাঝে এই পতাকার সাদৃশ্যই বর্তমানে উভয় জাতের পূর্বসম্বন্ধের স্মৃতিটুকু বজায় রেখেছে। একটা সেতুর সামনেই একটা স্তম্ভ, তার কাছেই একটি গাছ। তারপরই একটা লম্বা খুঁটির অগ্রভাগে পতাকাটি ঝুলছে।

পতাকার প্রায় আধ মাইল দূরে দুটো লম্বা ব্যারাক। তার কাছ দিয়েই রাস্তাটা চলেছে। পতাকাটির কাছে আসতেই ব্যারাক হতে দুজন লোক হাত নেড়ে কি বলতে লাগল। আমি তাদের যেন দেখি নি, এরূপ ভান করে চলতে লাগলাম। লোকদুটো সংগিনধারী সেপাই। তারা আমার দিকে এগিয়ে আসতেই, আমি বাইক থেকে নেমে পড়লাম। কাছে এসে কিচমিচ করে ওরা কি বলতে লাগল তার বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পারিনি। তবে ওরা ধাক্কা দিয়ে আমাকে যে সীমানার বাইরে বের করবার চেষ্টা করলে, তা এই পরিশ্রান্ত দেহটা ভাল করেই টের পেল। গত্যন্তর না দেখে আমি ধপ করে মাটিতে বসে পড়লাম। তারপর ওরাই পাসপোর্টের কথা ওঠালে। আমি পাসপোর্ট ও ভিসার পাতাটা উলটিয়ে দেখিয়ে দিয়ে পাসপোর্টখানা একটা সেপাইএর হাতে দিলাম। সে দৌড়ে ব্যারাকে গেল, ইত্যবসরে দ্বিতীয় সেপাইকে হাবভাবে ঢক ঢক করে জল খাওয়ার ইংগিত করলে সে ব্যারাক হতে জল এনে আমাকে খেতে দিলে। জল খেতে দিয়েই সে নিজে একটা সিগারেট ধরালে। আমার পকেটে হাত দিয়ে দেখি পকেটে একটাও সিগারেট নেই। আমি সেপাইকে কটা ফ্র্যাংক দিয়ে বাংলাতে বললাম, সিগারেট কিনে এনে দাও বাপু, পকেটে আমার সিগারেট নেই। তারপর সিগারেট খাওয়ার ভংগিটা হাত দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম। সে হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিলে, এখানে সিগারেট নেই, বাজারে আছে। অগত্যা নিজের পকেট থেকেই একটা সিগারেট বের করে দিলে। এদিকে অপর সেপাইটা এসেই আমার সাইকেলে চড়বার উপক্রম করলে। আমি একদম ভড়কে গেলাম। ভাবলাম, তুর্কীর সীমানা পার হবার মুখেই যদি জোচ্চোরের পাল্লায় বাইকখানা খোয়া যায়, তবে অস্থলে ভারী বিপদেই পড়তে হবে। তাই বাইকখানার হ্যাণ্ডেলটা দুহাতে খুব শক্ত করে ধরে রইলাম। সেপাই দুটোর প্রাণখোলা হাসিতে বুঝলাম যে, তারা আমার এই আচরণে যেন খুব আমোদ বোধ করছে। তাদের সহজ সরল ব্যবহারে মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। পুটলিটি নামিয়ে রেখে বাইকখানা দিলাম। একটু পরেই সেপাইটি ফিরে এসে আমাকে তার সংগে যেতে ইংগিত করল। পুটলিটি আবার বাইকে বেঁধে পায়ে হেঁটেই দুজনে চললাম। মাইল খানেক দূরে একটা রেল স্টেশনে পৌছে সেপাইর পেছন পেছন একটা কামরার ভেতর প্রবেশ করলাম। সেখানে দুজন

ভদ্রলোক বসেছিলেন। কপালে হাত ঠেকিয়ে দুজনকে একসংগে নমস্কার করতেই একজন বলে উঠলেন—পারলে ফ্রাঁসে মঁসিয়ে? সংগে সংগেই প্রত্যুত্তর দিলাম, পারলে ইংলে এণ্ড হিন্দুস্থানী মঁসিয়ে।

একটু পরেই আর একজন ভদ্রলোক এসে এদের সংগে যোগ দিলেন। এদের মধ্যে যে কথাবার্তা চলল তা বুঝলাম না, কিন্তু ত্রিপ্‌টিক কথাটা দু তিন বার উচ্চারিত হতে শুনলাম। তারপর দেখলাম, একজন গিয়ে আর একজন ভদ্রলোককে ডেকে নিয়ে এল। আগন্তুক এসেই আমাকে গুড্ মর্নিং করতেই বুঝলাম, ইনি নিশ্চয়ই দোভাষী হবেন। তাই নমস্কার বলেই প্রশ্ন করলাম, আপনি নিশ্চয়ই ইংলিশ জানেন? উত্তর এল, হাঁ, কিছু কিছু। এমেরিকান ম্যাট্রিক পাশ করেছি। ম্যাট্রিকের বিদ্যার দৌড় দেখে নিঃসংকোচে বলে ফেললাম, আমিও এমেরিকান এম্, এ, পাশ করেছি। ভাবলাম, হয়তো এতে ওদের শ্রদ্ধা বেড়ে যেতে পারে। হলও সত্যি তাই। ভদ্রলোকটি সবিনয়ে আমাকে ত্রিপ্‌টিক সম্বন্ধে বুঝিয়ে বললেন। সাইকেলের ত্রিপ্‌টিক নিই নি বলে আমাকে এর জন্য সাড়ে সাত লিরা জমা দিতে হল। অবশ্য এটা আমি তুর্কী-ত্যাগের সময়ে ফিরে পাব বলে আশ্বাস পেলাম। তারপর জামার পকেট এবং অন্যান্য জিনিষপত্র তল্লাস করে একটা তালিকা প্রস্তুত করা হল। তালিকার একখানা অবিকল নকল আমাকে দিয়ে সাবধান করে দেওয়া হল, যেন এর বেশী কিছু টাকা-পয়সা নিয়ে আমি তুর্কী ত্যাগ না করি করলে আবার সীমান্তে বিপদে পড়ব।

কাস্টমস্ অফিসের হ্যাংগাম চুকিয়ে বাইরে এসে অনেকটা স্বস্তি বোধ করলাম। সীমান্ত পেরিয়ে এবার হালকা মনে তুর্কীর মধ্যে যথেচ্ছ ঘুরতে পারব ভেবে সত্যিই আনন্দ হতে লাগল। সীমান্তের নিকটবর্তী ছোট্ট একটি গ্রাম্যবাজারে দশ ক্রুশনের দই ও একখানা রুটি কিনে খেলাম। তারপর এক প্যাকেট সিগারেট কিনে অচিন রাজ্যের একটা অজানা সুশীতল বৃক্ষচ্ছায়ায় পা ছড়িয়ে বসে আরাম করে একটা সিগারেট টানতে লাগলাম। এই অবসর মুহূর্তে একদিকে শ্যামল ভারত মাতার সহজ স্নেহাকর্ষণ, আর এক দিকে দীর্ঘ পথের নেশা মনকে চন্‌চল করে তুললে। তখনও বেলা পড়ে নি। আকস্মিক ভাবেই একজন পান্‌জাবীর সাথে দেখা। সে অনেকদিন ধরে এখানে আছে। তার ওখানে রাত্রি যাপনের জন্য অনুরোধ করল। কিন্তু মন মানল না।

আরও কিছু-দূর গিয়ে দর্তিওলে রাতটা কাটাব ভেবে যাত্রার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। সাইকেলের পাম্পটা পরীক্ষা করেই যাত্রা শুরু করলাম। চলেছি দর্তিওলের পথে। দিনের আলো নিবে আসছে।

কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। উদাসীনতা কি অবসাদ ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। নতুনের সংগে পরিচয় করবার ঘুমন্ত ইচ্ছাটাকে আবার জোর করেই জাগাবার চেষ্টা করলাম। অচিন অজানার রাজ্য, অপরিচিত লোকজন। অনির্দিষ্ট যাত্রা, পথে অভ্যর্থনা করবার কেউ নেই। এক্ষেত্রে মনের দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক।

শস্যহীন মাঠ। ধূধূ অনাবাদী প্রান্তর। তারই কঠিন বুকের উপর সরু একখানি পথ, যেন তৃষ্ণায় ধুকছে। অনেকটা যাবার পর দেখলাম, একটি লোক মেষ চরাচ্ছে। তার মাথায় নাইট ক্যাপ পরনে লম্বা প্যাণ্ট। কাছে গিয়ে দেখি প্যাণ্টের নিম্নভাগটা যদিও ইংলিশ কায়দায় তৈরী তবু উপরটা ইজারবন্দ দিয়ে জড়ানো। তুর্কীর পূর্বসংস্কার এখনও সম্পূর্ণ মুছে যায় নি। লোকটিকে প্রশ্ন করে জানলাম দর্তিওল আর বেশী দূরে নয়। দর্তিওলে পৌঁছে প্রথমেই রাত কাটাবার ব্যবস্থার জন্য ব্যস্ত হয়ে একটা হোটেল খুঁজছি এমন সময়ে একজন মিলিটারী পুলিশ এসে আমায় থানায় নিয়ে গেল। সেখানে পাসপোর্ট ইত্যাদি বেশ ভাল করে পরীক্ষা করা হল। এদের পাসপোর্ট পরীক্ষা এক আশ্চর্য ব্যাপার। আগাগোড়া পাসপোর্টখানা যতটুকু পারল নকল করে নিল। তারপর একটি সেপাই সংগে দিয়ে আমাকে নিকটস্থ হোটেলে পাঠিয়ে দিল। তখন সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে। রাস্তায় অনেকগুলো কৌতূহলী লোক দাঁড়িয়েছিল। হোটেল আসার সংগে সংগে তারা একে একে হোটেলে প্রবেশ করে নানা কথায় আমাকে বিব্রত করে তুলল। কিন্তু আমি তখন বড়ই পরিশ্রান্ত। তাই সকলকে বিদায় দিয়ে শুয়ে পড়লাম। খানিকটা বাদে খাবারের উদ্দেশ্যে আবার বের হলাম। একটু যেতে না যেতেই তরুণের দল আমাকে ঘিরে ফেলে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল। তারা অনেকেই কিছু কিছু ইংলিশ জানে। আমার আসার সংবাদ বহু পূর্বেই দর্তিওলের লোক জানতে পেরেছিল। একে তো শ্রান্ত, তার উপর খিদের তাড়না। ভারী মুশকিলে পড়লাম। এমন সময় ভীড় ঠেলে একজন পান্‌জাবী মুসলমান ভাই এসে আমার হাত ধরেই হিন্দুস্থানীতে বললে, চলুন, মাইল তিনেক দূরে আমার বাড়িতে দেশী

খাবার মিলবে। রাজী হলাম না। ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, সুবিধা হলে কাল সকালে তার বাড়ি হয়ে যাব।

দেশী ভাই একটা রেস্তোরায় প্রবেশ করে মালিককে বলে কতকগুলো মাছ ভাজিয়ে এনে আমাকে খেতে দিল। আমি মাছ ভাজা খাচ্ছিলাম এবং শুনছিলাম তার দুঃখের কাহিনী। সে ছিল একজন সেপাই। গত মহাযুদ্ধের সময় তুর্কীর সুলতান যখন জেহাদ ঘোষণা করেন, তখন সে ভেবেছিল যে জেহাদে যোগ দিয়ে সহিদ হয়ে স্বর্গে যাবে। কিন্তু সে সহিদও হল না, স্বর্গেও গেল না, এসে পড়ল খাস তুর্কীতে, যেখানে বর্তমানে আল্লা হো আকবর না বলে তান্দ্রে উলুদুর বলতে হয়। তার ধর্মের নেশা কেটে গেল, দেশের খাদ্যের কথা মনে পড়ল। দূর দেশে যারা বাস করে তাদের কাছে স্বদেশ যে কত প্রিয় তা বুঝানো শক্ত। দেশে ফিরে আসবার জন্য তার প্রাণ কাঁদছিল। দেশী খাদ্য খাবার জন্য তার প্রাণ আকুলিবিকুলি করছিল। কিন্তু তুর্কীর কোথাও ভারতীয় কারি পাউডার কিনতে পাওয়া যায় না।

পান্জাবী মুসলমান অকথ্য ভাষায় তুর্কী জাতকে গালি দিতে লাগল। সুলতানের জন্য সে লড়াই করতে এসেছিল। সুলতানকে তুরুকরা তাড়িয়েছে। যারা তাড়িয়েছে তারা কাফের। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, বিয়ে করেছেন, ছেলেমেয়ে হয়েছে, তাদের নিয়েই থাকুন।

লোকটি আরও রেগে বললে, এরা জাহান্নামে যাবে। পবিত্র কোরানকে এরা আরবী হতে কাফেরী ভাষায় অনুবাদ করেছে। এটা কি আল্লার গায়ে সইবে? নিশ্চয় এরা জাহান্নামে যাবে।

মনে মনে ভাবলাম, যদি এই লোকটির কোন কথা এরা কেউ বুঝে ফেলে, তবে ওরা জাহান্নামে যাক আর না-ই যাক, আমি তুর্কী হতে বহিষ্কৃত হব। তাই প্রসংগের মোড় ফিরিয়ে অন্য কথা পাড়লাম। পরদিন সকালে তার বাড়িতে খাবার জন্য সে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল এবং নিকটে উপবিষ্ট একজন ইংলিশ-জানা যুবককে তুর্কী ভাষায় তার বাড়ির ঠিকানা বলে দিয়ে গিয়েছিল।

তরুণটির প্রাণ সরল। নিজেকে তার কাছে নিঃসংশয়ে উন্মুক্ত করে ধরেছিলাম। ফিরবার পথে তারই অনুরোধে একটা কাফেতে প্রবেশ করলাম। কাফের পেছনে সুন্দর একখানা বাগান। বাগানে দীর্ঘ শীষ গাছ। আশেপাশে সবুজ ঘাস, তরুণ তুরুকের সজীব মনেরই মত। ঘাসের উপর সাজানো টেবিল।

চেয়ারে বসে কয়েকজন তুরুক রমণী নীরবে কাফি পানে রত। তারা আমার দিকে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করতে লাগল। বুঝলাম আমারই সম্বন্ধে ওরা কথা বলছে কিন্তু বুঝেও আমি যেন কিছুই বুঝি নি, এমনি ভংগিতে কাফি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। যুবকের সংগে তাদের সামাজিক উন্নতি ও পরিবর্তনের কথা চলতে লাগল। যুবক মাঝে মাঝে আমার কথার প্রতিবাদ করছিল। কিন্তু দৃঢ়তার সহিত আমি তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে, হয়তো আমার কথা তাদের এখন ভাল লাগবে না, কিন্তু যা বলছি, তা যদি না করা হয়, তবে তুরুক জাতের 'রুগ্নলোক' বদনামখানি ঘুচবে না। এরূপ করে অনেক কথা বলে শেষটায় হোটেলের দিকে রওনা হলাম। হোটেলের কাছাকাছি আসতেই নামাজের আজান শুনে সাথীকে বললাম, মসজিদে প্রবেশ করে নামাজ পড়া দেখতে কেউ আপত্তি করবে কি?

আমি মুসলমান ধর্ম মানি কি না, তরুণটি আমায় প্রশ্ন করলে।

—এতে মানামানির কি, শুধু দেখতে চাই. এ রকম প্রকাণ্ড বাড়িটা জুড়ে কি করা হয়।

আমার কথা শুনে বন্ধুটি যেন খুশীই হল। বললে, এখানে একটি লোককেও আমার বয়সী পাবেন না। দেখবেন সেই পুরানো যুগের গোটাকতক বুড়ো আরব-ভক্ত।

আস্তে আস্তে মসজিদে প্রবেশ করলাম। একটা মিটমিটে বাতির সামনে জন পনের যোল লোক ধ্যানস্তিমিত নেত্রে হাঁটু গেড়ে বসে। তাদের মুখে যেন কি একটা হারানোর ব্যথা সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে। নামাজ পড়া বোধ হয় শেষ হয়ে এসেছিল। একটু পরেই সকলে উঠে দাঁড়াল এবং একজন অপরিচিতকে দেখে ওদের মধ্য হতে একজন প্রবীণ এগিয়ে এসে আমায় প্রশ্ন করলে, আরব চা? অর্থাৎ আমি আরব কি না। আমি বলিলাম, হিন্দু চা। অর্থাৎ আমি হিন্দুস্থানের লোক। আমার তরুণ সংগীটি দোভাষীর কাজ করছিল। এখানে বলে রাখা ভাল যে, ওসব দেশে হিন্দু বলতে হিন্দু ধর্মাবলম্বী বোঝে না, ওরা বুঝে হিন্দুস্থানে যার জন্ম ও যার ভাষা হিন্দুস্থানী। তাই পুনরায় প্রশ্ন করলে, আমি ইসলাম ধর্মাবলম্বী কি না? নির্লিপ্ত ভাবেই উত্তর দিলাম, ধর্মের আমার বিশেষ কোন বালাই নেই। এরই মধ্যে অনেকেই আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমার কথা শুনে সকলেই যেন একটু বিস্মিত ও ক্ষুণ্ণ হল। আক্ষেপের সুরে

আর একজন বলল, তাহলে ঈশ্বর বলে কি কিছু নেই? প্রেরিত পুরুষ কি মিথ্যা, স্বর্গ-নরক কি কল্পনা?

ভাবলাম, এদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দিয়েই বা লাভ কি? তাই কথাটা পালটে নিয়ে বললাম, ভগবান হয়তো থাকতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে এসব কথাকে বাজে কথাই ভাবি, এসব নিয়ে মাথা ঘামাই না। পথ চলা আমার নেশা, তাই দেশবিদেশে ঘুরে বেড়ানোই আমার এখনকার মত পেশা। তবুও আমার দেশে এবং আমার জাতের মধ্যেই বিশ্বাসী মুসলমান, খৃস্টান ও বৌদ্ধ আছে। অপেক্ষাকৃত কম বয়সের একজন জিজ্ঞাসা করলে, মুস্তাফা কামালের নাম কি আপনাদের দেশের লোক জানে?

—শুধু জানা নয়, তাঁকে তারা দস্তুরমত শ্রদ্ধা করে। তাঁর সামাজিক পরিবর্তনকে উন্নতির সোপান বলে গ্রহণ করে। আতা তুরুক শুধু তুরুক জাতকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন না, সমুদয় পদানত মর্যাদাহীন জাতের ভিতরে অনুপ্রেরণার বাণী বহন করে তিনি ধ্যানের মূর্তিতে পরিণত হয়েছেন। গান্ধির নামেরই মত তাঁর নাম ভারতের ঘরে ঘরে প্রচারিত। সেই নাম শুনলে লোকের আনন্দ হয়। যাক, এখন আপনারা প্রাতে কি কথা বলে আজান দেন, দয়া করে যদি বলেন, তবে অনুগৃহীত হই। দেশে গিয়ে বলব আপনাদের প্রভাতী আজানের মর্মবাণী।

এতে তারা রাজী হলেন। আমি নিজেই লেতিনী অক্ষরে তাদের প্রার্থনা টুকে নিলাম। পুরাতন লেটিন অক্ষরকে ওরা লেতিনী বলে থাকেন। লেখা হয়ে গেলে তাদের দিয়ে ফের শুদ্ধ করিয়ে নিলাম। নিম্নে তার অবিকল নকল বাংলা হরফে লেখা গেল।

তান্দ্রে উলুতুর। তান্দ্রে এল্‌ছিছিদির।
তান্দ্রে উলুতুর। দির মহাম্মদ।
তান্দ্রে উলুতুর। দির মহাম্মদ।
তান্দ্রে উলুতুর। হাজি ফালাহা।
স্থপ হেসিছ বিলিরিম। হাজি ফালাহা।
তান্দ্রে দাম বাক্‌সা। হাই দীন নামাজা।
ইয়কতর তাপাজাক। হাই দীন নামাজা।
ইয়কতর তাপাজাক। তান্দ্রে উলুতুর।

শুপহেশিয় বিলিরিম। তান্দ্রে উলুতুর।
বিল দিরিরিম। তান্দ্রে দান বাক্সা ইয়কতর তাপাজাক।

সংগীটিকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, নামাজের কোন পরিবর্তন হয় নি, পূর্বের মতই আছে। কথাবার্তায় অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল, তাই আর বিলম্ব না করে উপস্থিত সকলের নিকট সসম্ভ্রমে বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরে সটান শুয়ে পড়লাম। পরদিন প্রাতে সেই তরুণটিকে সংগে নিয়ে ভারতী ভাইএর বাড়ির দিকে রওনা হলাম। সুন্দর সাজানো পল্লীগ্রাম, তার মাঝ দিয়ে পথ চলেছে, আঁকাবাঁকা পথ। এরই মাঝে ঝাড়ুদারগণ আপন আপন কার্য সমাপন করে পথ হতে বিদায় নিয়েছে। আমাদের দেশের মত পথের আশেপাশে দুর্গন্ধ নেই। তুর্কীতে মাইনে করা মেথর পায়খানা পরিষ্কার করে না। ঝাড়ুদার আছে, মেথর নেই। মলমূত্র যাতে মাটির নিচ দিয়ে পাইপের সাহায্যে শহর অথবা গ্রামের বাইরে বহুদূর কোথাও চলে যেতে পারে, তার বন্দোবস্ত করা হয়। কদাচিৎ নিজেকেই নিজেদের পায়খানা পরিষ্কার করতে দেখা যায়। যুবককে একথাটা বার বার জিজ্ঞাসা করেছিলাম বলে সে আমাকে বললে, ঐ কথাটা নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন? জবাব দিতে গিয়ে আমার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে এল। পথে দাঁড়িয়েই বলতে হল আমাদের দেশের হরিজনদের কথা। যুবক ঘন ঘন মাথা নেড়ে বললে, এটা হতে পারে না, কখ্খনও না। আমার কথা যুবক বিশ্বাস করল না।

দেশের ভাইএর বাড়িতে পৌঁছতে আমাদের দেরি হওয়াতে দেশী ভাই আমাদের জন্য পথে বেরিয়েছিল। সংগের যুবক তাকে পাওয়া মাত্র উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে তুর্কী ভাষাতে অনেকক্ষণ ধরে কি বলল। তারপর আমার দিকে ফিরে বললে, মিথ্যাবাদী পর্যটক আপনি। আমি মাথা নীচু করে থাকতে বাধ্য হলাম, কারণ দেশের ভাই বললে, এইসা বাত মত বাত্‌লাও পরদেশমে, তুম তো চলা যাওগে, মেরা হাল কেইছা হোগা বাত্‌লাও।

চুপ করে দেশী ভাইয়ের বাড়ি এসে দেখি ভাত, মুরগীর মাংস, দুম্বার কোরমা এবং প্রচুর দই টেবিলে সাজানো রয়েছে। অনেক দিন পর দেশী খাদ্য বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে খেয়ে অত্যন্ত আনন্দ হল। দেশী ভাইএর আদর-আপ্যায়ন এবং তার স্ত্রীর আধ আধ হিন্দুস্থানী বুলি শুনে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলাম। মিনিট পনর বিশ্রাম করে দেশী ভাই, তাঁর স্ত্রী

এবং ছেলেপিলের কাছ হতে বিদায় নিয়ে যুবককে ফের একটু এগিয়ে দিতে অনুরোধ করলাম। সে তাতে স্বীকৃত হল। পথে এসে তাকে বুঝিয়ে বললাম, যা বলেছি, তা সবই সত্য, তবে আমার দেশী ভাই তা স্বীকার করবে না, স্বীকার করতে পারে না। কারণ তাতে যে দেশের বদনাম হয়। আমাদের দেশের ধর্মের সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক প্রথার সাম্রাজ্যবাদ যদি বুঝাতে হয় তবে অনেক সময় যাবে, অতএব বিদায় দাদা, এখন আসি।

যুবক আমারই সামনে বলতে লাগল, রিলিজিয়াস্ ইম্পিরিয়েলিজম, এটাকে বের করতে হবে, তাড়িয়ে দিতে হবে পৃথিবী হতে।

যতক্ষণ দেখা গেল, যুবক তার রুমাল উড়িয়ে আমাকে তার বন্ধুত্বের কথা জানাতে লাগল। তারপর সে পাহাড়ের পেছনে আড়াল হল। আর তাকে দেখা গেল না। কিন্তু যখনই পেছনে তাকাই, তখনই মনে হয় সেই যুবকের মুখ, আর তার নির্ভীক কথা—এটাকে তাড়িয়ে দিতে হবে। তার সংগে সংগে মনে হতে লাগল আমার দেশের ছবি—দরিদ্রের প্রতি অত্যাচার করাই যেন আমাদের ধর্ম পবিত্রতা এবং জাত্যাভিমান। এসব কথা ভুলতে পারা যায়, কিন্তু নির্ভীক সেই তরুণের স্মৃতিরেখা ভুলবার নয়।

দর্তিওল ছেড়ে আদানার দিকে রওনা হলাম। পথ সুগম নয়। পথের উপর বড় বড় পাথর পড়ে আছে। মাঝে মাঝে পাথরের উপর সাইকেলটা হোঁচট খেয়ে আমাকে সতর্ক করে দিচ্ছিল, আনমনা হয়ে পথচলা অন্যায়। পথের দুদিকে গ্রামের চিহ্নও নেই, বেলুচিস্থানের মত উঁচু মালভূমি। মনে মনে ভাবছিলাম ভারতের মত তুর্কীতে গ্রামের পর গ্রাম পাব, আনন্দ করে পথ চলব। কিন্তু এ কি, এ যে লোকশূন্য প্রান্তর! বিকালের দিকে একটা গ্রাম এল। গ্রাম ছোট এবং নতুন। বোধ হয় অধিবাসীরা অন্য কোন জায়গা হতে এসেছে। মাঝে মাঝে আমার মত দুএকটা কালো লোকও চোখে পড়ল। প্রত্যেক গ্রামেই ছোট ছোট হোটেল আছে। পুলিশের সাহায্যে হোটেলে গিয়ে উঠলাম। প্রশ্ন উঠতে পারে, যে স্থানের ভাষা জানি না, সে স্থানে কি করে পুলিশের সাহায্যে হোটেলে যাওয়া যায়। হ্যাঁ, যাওয়া যায়। হোতেল বলে একটা শব্দ ইউরোপের এবং তুর্কীর সকল লোকই বোঝে এবং এটাও বোঝে, লোকটি হোটেলেই থাকবে। অতএব হোতেল শব্দটা উচ্চারণ করলেই সাধারণ লোকেও হোটেল দেখিয়ে দেয়। কিন্তু গ্রামে অথবা শহরে

গিয়ে স্বেচ্ছায় আমি সাধারণ লোকের কাছে কোন কথা বলতে ভালবাসতাম না। বুঝতে পেরেছিলাম, এতে সাধারণ লোকের বেগ পেতে হয়।

তুর্কী দেশটাতে নতুন পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তনকে পেছিয়ে দেবার জন্য, পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনবার জন্য, অনেক বৈদেশিক তুরুকদের বন্ধু সেজে তুর্কী ভ্রমণে আসছে। তারা গোপনে কি করে কে জানে, কিন্তু আমি তো কারুর মাইনে খেয়ে ভ্রমণ করতে আসিনি, আমি এসেছি দেখতে, জানতে।

দর্তিওলের হোটেলটি ছিল পুরাতন ধরণের। নতুন গ্রামের হোটেলটিও নতুন। তার আসবাবপত্র এবং আরাম-উপকরণও ইউরোপীয় ধরনের। গ্রামের লোক কেউ গ্রীক ভাষা, কেউ স্লাভ ভাষা বলতে পারে। মাঝে মাঝে দুএকজন আছে যারা বেশ আমেরিকান ধরনে আমেরিকানও বলে। গ্রামের লোক আমাকে সুনজরে দেখছিল না বললে দোষ হয় না। দুএকজন পাশ কাটিয়ে যাবার বেলা শুধু বলছিল আরব চা, অর্থাৎ লোকটা আরব-দেশীয়। আমি সে সব কথার প্রতিবাদ করিনি। বিকালে লোকে ভর্তি একটা কাফেতে গিয়ে উঠলাম। অনেকেই আমার দিকে চাইল। আমি কারুর দিকে না তাকিয়ে বয়কে ইংগিতে ডেকে বললাম, ইয়ূর্ত একমেক এণ্ড সুগার—দই, রুটি এবং চিনি। চিনিকে তুরুক ভাষায় সুগারী বলে। কিন্তু কথাটা ভুলে গিয়েই এণ্ড সুগার বলেছিলাম। আমার এণ্ড সুগার কথাটা সে মোটেই বুঝেনি। সে আমার মুখের দিকে হাঁ করে দাঁড়াতেই আমি বললাম, নিক্স ফাস্টেণ্ড ইংলে? অর্থাৎ ইংলিশ বোঝ না? বয় বলল, নাই নাই, অর্থাৎ বুঝি না। আমাদের কথা শুনে একজন ভদ্রলোক আমার কাছে এসে বললেন, মশায় কোন্ দেশের লোক? আমি বললাম, হিন্দুস্থানের। হাঁ, বৃটিশ কলনী। কথাটা আমার বুকে এমন একটা আঘাত করল যে লোকটির মুখের দিকেও তাকাতে ইচ্ছা হল না। শুধু বললাম, আপনি বৃটিশ বুঝি? আমার কালো মুখের উপর গাঢ় কালিমা পড়ে এক নতুন আকৃতি ধারণ করেছিল। আমার সেই অবস্থা দেখে লোকটি হেসে বলল, আমি তুরুক চা। এই ভদ্রলোক অনেক দিন আমেরিকায় ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন আমেরিকার সরকার তাঁকে কি কারণে তাড়িয়ে দেয় এবং তাঁর দেশে পাঠিয়ে দেয়। তখন তাঁর দেশ ছিল সার্বিয়াতে। কিন্তু

আতা তুরুক ইউরোপ হতে অনেক তুরুককে এশিয়াতে এনে জমি দিয়েছেন, এদের উন্নতির জন্য। এই ভদ্র লোকটিও আতা তুরুকের আদেশ মেনে নিয়ে এই নতুন গ্রামে নতুন বাসিন্দা হয়েছেন। ভদ্রলোক আমাকে তুর্কী সম্বন্ধে অনেক কথা শোনালেন এবং ভোজনান্তে আমার হোটেলে এসে বসলেন। সাধারণত আমি কারুর নামধাম জিজ্ঞাসা করি না। ভদ্রলোক নিজেই বললেন তাঁর নাম সাকেত। আমার পরিচয় আমি পূর্বেই দিয়েছিলাম।

কথায় কথায় সাকেত বললেন, তুর্কীর ওপর দিয়ে অনেক ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে, আরও কত বিপত্তি সামনে আছে তার ঠিক নাই। এরই মাঝে তুর্কীতে সোসিয়েলিজম্ দেখা দিয়েছে। সোসিয়েলিজমটা তুর্কীর স্ত্রীলোকরা পুরুষদের চাইতে বোঝে ভাল, কারণ তাদের যত কষ্ট ছিল, পর্দা প্রথা অপসারণের পরও নাকি তার সবটা কমে নি। তাদেরই সন্তানগণ মাতার কাছ থেকে নতুন তথ্য পেয়ে হয়তো একদিন নতুন কিছু করে বস্‌বে। হয়তো তুর্কীকে বখারাতে পরিণতও করতে পারে।

আমি বললাম, বন্ধন যখন মুক্ত হয়, উচ্ছৃঙ্খলতা তখন এসে দেখা দেয়। তখন হয় নতুন কর্মপদ্ধতির আরম্ভ। নতুন পদ্ধতিকে প্রচলন করবার জন্য ব্যক্তিত্বের দরকার। ব্যক্তিত্ব আপনাদের আছে। যিনি আপনাদের পরিবর্তন এনেছেন, সেই আতা তুরুকের ব্যক্তিত্বে আমি সন্দিহান হতে পারি না। আমার মনে হয়, আপনাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। এখন শুধু পোশাক বদলাচ্ছে, যদিও মন বদলায় নি। কিন্তু ভালর জন্য যদি মন বদলায় তবে ক্ষতি কি? নরসমাজ পরিবর্তনশীল। তাতে যে প্রতিবন্ধক জন্মাবে সে-ই মরবে, এটা কি আপনি জানেন না?

সাকেত জবাব দিলেন, নিশ্চয়ই জানি, তবে কিনা আমি ক্রমশ পরিবর্তনেরই পক্ষপাতী।

—আপনার মতের জন্য মানব-সমাজ বসে থাকবে না, মিঃ সাকেত। দুঃখিত হবার কিছুই নেই। আপনি তুরুক জাতের কথা ভাবছেন, কিন্তু যারা নর-সমাজের কথা ভাবে, তাদের মনের গতি অন্যরূপ। বদলাতে যখন হবেই, তখন আর ভেবে চিন্তে লাভ কি?

পরদিন প্রাতে কিছু দূর থেকেই একটা নতুন ধরণের প্রস্রবণের ধারা দেখে সাইকেল থেকে নেমে পড়লাম। কোথা হতে জল আসছে ঠিক করে উঠতে

পারি নি। প্রস্রবণটি অভিনব, প্রকৃতির উপর মানুষের কারিগরি। পথিকের পিপাসা নিবারণার্থ বহু দূরের প্রস্রবণ থেকে জল আনার এমন কৌশল সিরিয়া, লাবানন্ এবং ইরানে দেখি নি। কোন পাইপের দ্বারা সে জল আনা হয় নি, আনা হয়েছে পাহাড় কেটে, এবং সেই আঁকাবাঁকা ধাবমান জলস্রোতের ওপর ও নিচ পাথর এবং সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরূপ করে প্রস্রবণের জল-পথের কাছে এনে হাজির করার প্রণালী ইউরোপের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত। এমন কি লণ্ডনের ফ্লীট স্ট্রীটেও সেরূপ জলের ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। ফ্লীট স্ট্রীটের সেই জল পান করবার জন্য দুটি কাপ রাখা হয়েছে। কিন্তু এই লোকালয় বহির্ভূত স্থানে ব্যবস্থাপকগণ কাপ রাখার কোন প্রয়োজন বোধ করেন নি। নতুন ধরনে প্রস্রবণের জল আনার নিপুণতা দেখে পাইপের পাশে বসে বসে ভাবলাম প্রকৃতির দান এবং মানুষের গ্রহণের ক্ষমতার কথা। মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির ক্রমবিকাশ আর ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা ভেবে অন্তরে পুলক জাগল। অধিক বিশ্রামের পর অবসাদ আসে, তাই জলের একটানা সুরের মায়া কাটিয়ে চলার পথে যাত্রা শুরু করলাম।

সামনেই উঁচুনিচু ভূমি। কখনো বা সাইকেল চেপেই চলেছি, আবার কখনো বা পায়ে হেঁটেই চলেছি। পথে পাহাড়ের গাছপালা দেখে মনে হল, এদের সংগে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বৃক্ষরাজির কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু এদের সৌন্দর্য দেখে মন পরিতৃপ্ত হয়। কি সুন্দর তাদের পাতা! মৃদুমন্দ বাতাসে ঝির ঝির করে কাঁপছে। যদিও প্রভাতের শিশিরবিন্দু শুকিয়ে গেছে, তবুও বৃক্ষলতার সবুজ রং প্রাণে অনুপ্রেরণা এনে দেয়। এরই জন্যে আমাদের দেহের শ্রান্তির কাছে মনের অফুরন্ত উৎসাহ এবং সজীবতাকে বলি দিতে হয় নি। কিছুক্ষণ যাবার পরই একটি সুন্দর দৃশ্য দেখতে পেলাম। পাহাড়ে-ভূমির সমাপ্তি হয়েছে। সামনেই শস্য-শ্যামল উপত্যকা। দূর হতেই শীষ বৃক্ষের শির দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে জমকালো পাইন বৃক্ষগুলি দাঁড়িয়ে আছে। উপত্যকার এক পাশে পাহাড়ের গায়ে একখানা ছোট গ্রাম। গ্রামের গৃহমালা আমাকে আপন ঘরের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। আমি নতুন শক্তি নিয়ে গ্রামের দিকে এগিয়ে চললাম।

গ্রাম পুরাতন ধরনের। নতুনের ছাপ এরই মাঝে এসে পড়েছে। নতুনকে লোকে সহজে বরণ করতে চায় না। নতুনকে পুরাতনের স্থানে বসাতে হলেই

শক্তির ব্যবহার করতে হয়। নতুন পথ গড়তে হলেই পুরাতন গৃহ, পুরাতন গলি, পুরাতন আবর্জনা সরিয়ে দিতে হয়। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। যারা ধর্মভাবাপন্ন, তারা স্বর্গে একটি সীট কেনবার জন্য মনপ্রাণ ঢেলে দেয়, কিন্তু পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার জন্য তেমন কিছুই করতে রাজী নয়। গ্রামের পুরাতন মসজিদ নতুন বলেই মনে হয়, অথচ এমন অনেক ঘর রয়েছে, যার মাঝে এক মিনিটও বসে থাকতে ইচ্ছা হয় না। এসব ঘর এখন পরিত্যক্ত। নতুন ঘর, নতুন পথ, নতুন করে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে বটে, কিন্তু লোকের মনের পরিবর্তন হয় নি। কারণ লোকের মনের পরিবর্তন হলে তাদের চাল-চলনে বোঝা যেত। আমি এটি বুঝতে পেরেছিলাম বলেই গ্রামে গিয়ে সামান্য কিছু খেয়েই আবার পথে এসেছিলাম। পথের পাশে শীষ বৃক্ষের ছায়া আমার পরিশ্রম অপনোদন করেছিল। শীষ বৃক্ষ পাতা বদলিয়েছে, ছাল বদলিয়েছে, এমন কি তার যে পুরাতন পত্রগুলি মাটিতে পড়ে শুকিয়ে গেছে তারই উপর নতুন ঘাস গজিয়েছে। আমি নতুন, আমি বদলাই, তাই নতুনকেই ভালবাসি। পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে থাকা তো আমি চাই না।

বেলা চারটার পূর্বেই অন্য একখানা গ্রামে পৌছলাম। গ্রাম বেশ বর্ধিষ্ণু, শহর বললেও দোষ হয় না। হোটেল আছে, জেন্দআর্ম আছে, কাফে আছে। একটা কাফেতে আবার স্টেজ পর্যন্ত আছে। আমি আমার প্রথামত একটি হোটেলে গিয়ে কতক্ষণ বিশ্রাম করলাম। তারপর শরীরটা ঠাণ্ডা জলে মুছে নিয়ে, আবার ভাল করে পোশাক পরে জুতাটা একটু পরিষ্কার করে গ্রামের রেস্তোরাঁয় খেতে বসলাম। রেস্তোরাঁয় নানা জাতীয় লোক; বেশ হেসে খেলে কথা বলে কেউ বা খাবার খাচ্ছিল, কেউ বৈকালিক ভোজন, কেউ বা রোজের কাফি খাচ্ছিল। আমি নতুন লোক, আমার আগমনে কেউ একটু মুচকি হাসল, কেউ বা আমায় একদম অবহেলা করল, আর কেউ বা জানতে চাইল আমি কে।

আমার খাদ্য দই, রুটি, চিনি, আর পেলে মাছ ভাজা এবং দুম্বার কাবাবও খাই। কিন্তু ঐ কথা কটি কখনও মনে থাকে, কখন বা থাকে না, এই যা হল আমার দোষ। ঐ রেস্তোরাঁয় কিন্তু কথার পরিবর্তে ইংগিতে সকল জিনিস চাইতে লাগলাম। রেস্তোরাঁ-বয় খুব স্ফূর্তির সংগে আমার আদিষ্ট জিনিসগুলি পরিবেষণ করছিল। ভোজন সমাপন করার পূর্বেই দু-একজন লোক আমার

কাছে এসে নানা কথা ( তুরুক নয়তো ফরাসী ভাষায় ) জিজ্ঞাসা করছিল। কিন্তু আমি ফরাসী কিংবা তুরুক কোনটাই জানি না, ভাংগা ভাংগা ফরাসী ভাষায় বুঝিয়ে দিলাম, আমি একজন পর্যটক, জাতে হিন্দু, হিন্দুস্থানের বাসিন্দা।

হিন্দুর কি ভাষা, তাই নিয়ে কএকজন লোক একটু আলোচনা করছিল। একজন বলছিল হিন্দুরা ওর্‌দো ভাষায় কথা বলে থাকে, অন্য একজন বলছিল হিন্দুস্থানী। উর্দ্দু কথাটার ও রকম উচ্চারণ শুনে আমার খুব হাসি পেয়েছিল। রেস্তোরাঁয় এমন কয়েকজন লোকের সংগে সাক্ষাৎ হয়েছিল, যারা গত মহাযুদ্ধের সময় রেংগুন সেনট্র্যাল জেলে আবদ্ধ ছিল, তারা মামুলী দুএকটা কথা বলেই কথা বন্ধ করে দিল। আমার বেশীক্ষণ রেস্তোরাঁয় বসে থাকতে ভাল লাগল না। খাবার খেয়ে গ্রামে বেরিয়ে পড়লাম। গ্রামের সৌন্দর্য, লোকের রীতিনীতি, পথঘাট পরিষ্কার আছে কি না, এসব দেখতে আমার ইচ্ছা হল না। ভাবতে লাগলাম, এদের মাঝে হরিজন আছে কি না, তাই দেখতে হবে। রাত্রি এক প্রহর পর্যন্ত তার অনুসন্ধানে বেড়িয়েছি, কিন্তু কোথাও হরিজন খুঁজে পাই নি। বেশীক্ষণ বাইরে থাকতে হল না, পথে একজন জেন্দআর্মের সংগে সাক্ষাৎ হল, তাকে নিয়েই হোটেলে ফিরে এসে নানারূপ কথা বলে, রাত প্রায় ১১টার সময় বিদায় দিয়ে শুয়ে পড়লাম। জেন্দআর্ম ফরাসী ভাষায় শিক্ষিত থাকায় কথা বলতে অসুবিধা হয়েছিল বটে, কিন্তু যেখানে মনের মিল, সেখানে ভাষার অভাব হয় না।

---

# আংকারার পথে

দূর হতেই আদানার রেল স্টেশন দেখে মনে বেশ আনন্দ হল। শরীরের এবং মনের যে গ্লানি ছিল, তা নিমেষেই চলে গেল। পায়ে শক্তি এল, সাইকেল শন শন করে এগিয়ে চলল। আদানা স্টেশনে পৌছতে বেশীক্ষণ লাগল না। স্টেশনে গিয়ে মনে করলাম, একটা আস্তানার খোঁজখবর নেব। কিন্তু আমার ইংলিশ, বাংলা, হিন্দুস্থানী, মালয়, চীনা কোন ভাষাই কেউ বুঝল না। আমার কোন কথা কেউ যেন বুঝতে চায় না। সেজন্য আমি মোটেই চিন্তিত হই নি। শহরের রাস্তা ধরে অনির্দিষ্ট ভাবে ঘোরাঘুরি করছিলাম এবং দেখছিলাম এই শহরের এমন দুর্দশা কেন। এস্‌ফাল্‌থের রাস্তাগুলি নষ্ট হয়ে গেছে, আশেপাশের বাড়িগুলি লক্ষ্মীছাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যায়, এই শহরের একদিন শ্রী ছিল। আমি যখন শহরের পুরাতন অবস্থা এবং বর্তমান অবস্থা চিন্তা করে আনমনে চলছিলাম, এমন সময় একদল ছোট ছেলেমেয়ে সাইকেলের আগে পিছে ছুটাছুটি করতে লাগল এবং আরব চা বলে চীৎকার করে ভারি অতিষ্ঠ করে তুলল। বিরক্ত হয়ে একটা সরাইয়ে ঢুকে পড়লাম। সরাই ইরানী ধরনের। ইরানীরা বর্তমানে সরাইকে গ্যারেজ বলে। কিন্তু এই সরাইএ প্রবেশ করে দেখলাম এতে কোন মোটর গাড়ি নেই, মোটর গাড়ি মেরামতের কোন যন্ত্রাদিও নেই, প্রকৃতই একটা সরাই। সরাইকে হোটেলে পরিণত করা হয়েছে মাত্র। সাইকেল হতে নেমে একটু দাঁড়াতেই একজন ভদ্রলোক এসে বললেন, আইএ বইঠিয়ে। ইনিই সরাইএর মালিক। গত মহাযুদ্ধের সময় এই ভদ্রলোক ভারতের কোনও জেলে যুদ্ধের কয়েদী-রূপে ছিলেন এবং সেখানেই হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা করেন। লোকটির সংগে একটু কথা বলতে পারব ভেবে আশ্বস্ত হলাম। অনেকক্ষণ কথা বলতে না পেরে ভিতরটা যেন হাঁপিয়ে উঠছিল। আধ ঘণ্টা খানেক কথা বলার পর রাত্রে থাকার জন্য নির্ধারিত ভাড়া দিয়ে একটি রুম ঠিক করলাম। সাইকেল হতে পিঠ-ব্যাগটা খুলে ঘরে নিয়ে রেখে আবার নিচে আসতেই দেখি, একজন লোক আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। সে হিন্দুস্থানী ভাষাজানা লোকটির সাহায্যে

নানা কথা আমাকে জিগ্‌গাসা করল। পরে বুঝলাম, লোকটি গুপ্ত পুলিশ এবং সে আমার প্রতি মোটেই সন্তুষ্ট নয়। কেন সে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট তার কারণ সরাইওয়ালাকে জিগ্‌গাসা করলাম। কিন্তু আমার কথার জবাব দেওয়া দূরে থাকুক, সরাইওয়ালা যে হিন্দুস্থানী জানেন তা-ও যেন বলতে চাইলেন না। ক্ষণিকের মাঝে এই পরিবর্তন দেখে আমার মনে হল মিঃ সাকেতের কথা। আমার সংগে কথা বলবার জন্যে অনেকেই এসেছিল, কিন্তু গুপ্ত পুলিশের ইংগিতে সকলেই কথা বলা বন্ধ করল। এরূপ নির্বাক অবস্থায় বসে থাকা আর আমার ভাল লাগল না। সরাই হতে বের হয়ে গিয়ে একটি ছোট দোকান হতে দই এবং রুটি কিনে এনে খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

সকালে উঠে প্রথমেই পুলিশ স্টেশনের খোঁজে বের হলাম। পথে যাকে সামনে পাই, তাকেই পুলিশ স্টেশনের কথা জিগ্‌গাসা করি। কিন্তু কেউ আমার কথা বোঝে না। একটা সোজা পথ ধরে চলেছি, এমন সময়ে গতকল্যকার সেই লোকটি সাইকেলের সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে নামতে ইংগিত করল। নেমে ইংলিশে লোকটিকে বল্‌লাম, তোমাদের হেড অফিস কোথায় হে? কথার জবাব না দিয়ে সাইকেলে বাঁধা ব্যাগটি খুলে ছবির কার্ডগুলো ও খানকতক চিঠিপত্র নিয়ে সটান রওনা হতে দেখে আমি তো প্রথমে হতভম্ব। জোচ্চোর নাকি? একটু দৌড়ে গিয়ে লোকটাকে সাপ্‌টে ধরে আমার জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে রেগেমেগে বললাম, তুমি যে পুলিশের লোক তার প্রমাণ কি? আমার শারীরিক শক্তির পরিচয় পেয়ে লোকটি যেন একটু বিস্মিত হল। ইতিমধ্যে লোকজনও এসে জমল। যা হোক, তার পিছু পিছু একটা ফাঁড়িতে গেলাম এবং কার্ডগুলো জমা দিলাম।

বড় বড় শহর ছাড়া তুর্কীতে ছোটখাট টাউনে জেন্দআর্মই সাধারণত পুলিশের কাজ করে। আদানা বড় শহর। এখানে সাধারণ পুলিশের কড়াকড়ি খুবই বেশী। অনেক খুঁজে হেড অফিসে গেলাম। দোতলায় উঠে গিয়ে দরজার কড়া নাড়তেই একটি লোক বের হয়ে এসে তুর্কী ভাষায় কি বলল তার কিছুই বুঝলাম না। বুদ্ধি করে ভাংগা ফরাসী ও ডচ ভাষা মিলিয়ে বললাম, নিক্স পারলে ফ্রাঁসে, পার্লে ইংলে অর্থাৎ ফরাসী বলতে জানি না, ইংলিশ বলতে জানি। লোকটি একখানা চেয়ার দেখিয়ে বসতে ইংগিত করে চলে গেল। একটু পরেই একজন লোক এলেন। তাঁকে দেখেই স্বদেশবাসী বলে মনে হল।

তিনি হিন্দুস্থানীতেই কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তাঁর হিন্দুস্থানী উচ্চারণ শুনেই মনে হল তিনি হিন্দুস্থানী জানেন না। তবে আকৃতিতে তিনি অনেকটা বাংগালীর মতই, তাই সাহসে ভর করে জিগ্গাসা করলাম, আপনি কি বাংগালী? তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, হ্যাঁ আমি বাংগালী নিশ্চয়ই। তবে আমার নাম কি, বাড়ি কোথায়, এসব প্রশ্ন কখনও জিগ্গাসা করবেন না। কারুর নাম জিগ্গাসা না করাই আমার অভ্যাস। অতএব এতে আমার কিছুই এসে গেল না। আমি তাঁকে শহরে পৌছবার পর হতে গুপ্ত পুলিশের সেই কার্ড নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। তিনি জোরে চীৎকার করে বললেন—ভায়া, প্রতিহিংসা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমি বললাম, প্রতিহিংসা কি মশাই, আমার চৌদ্দ পুরুষের মাঝে আজ পর্যন্ত কেউ এদেশে আসে নি, আমিই প্রথম।

বাংগালী ভদ্রলোক বললেন, এখানেই ভুল করছেন। আপনার চৌদ্দপুরুষ কেউ আসেন নি সত্য কথা, কিন্তু আপনার দেশের লোকের মধ্যে এখনও জাতীয় ভাব জাগে নি, তাই এসব কথা বলছেন। এসব দেশে জাতীয় ভাব জেগেছিল অনেকদিন পূর্বে। এদের কাছে জাতীয় ভাব পুরাতন হয়ে গেছে, এরা আর এক স্তর এগিয়ে গিয়ে ইন্টারন্যাশন্যালিজমের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমাকে আশ্বাস দিয়ে তিনি আবার বললেন, আর অসুবিধা হবে না, চলুন এখন দেশী ভাইদের সংগে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিই।

মাইল খানেক হেঁটে গিয়ে আমরা একটি ছোট মসজিদের সামনে এসে দাঁড়ালাম। মসজিদে প্রবেশ করতে আমার পা উঠছিল না। কিন্তু ভদ্রলোক বললেন, ভয়ের কোন কারণ নাই। এটা হিন্দুদেরই মসজিদ। ঐ দেখুন আমাদের জাতীয় পতাকা পত পত করে উড়ছে। আর ঐ পাঠান মসজিদ, তার কাছে আফগানী পতাকা উড়ছে।

যেখানে জাতীয় পতাকা সমুন্নত শীর্ষে আকাশে ওড়ে, সেখানে আমার প্রবেশ অধিকার আছে ভেবেই আর কোন কথা না বলে মসজিদে প্রবেশ করলাম।

মসজিদের আংগিনায় প্রবেশ করে দেখি চারজন পান্জাবী মুসলমান হাত পা ছড়িয়ে বসে আছে। আমাদের দেখামাত্রই তাদের মধ্যে যেন নবজীবন এল। তারা সমাদর করে আমাদের বসাল। আমার পরিচয় পেয়ে তারা এত খুশী হল যে একজন তৎক্ষণাৎ একটি মদের বোতল খুলে পেয়ালা ভর্তি করে আমার হাতে

দিল। আমি তাদের আনন্দে বাদ সাধি নি, মদের পেয়ালাতে চুমুক দিয়ে বললাম, এটা নিশ্চয়ই আরক হবে। আরবরা মদকে আরক বলে। তারা প্রত্যেকে এক এক পেয়ালা মদ খেয়ে নিয়ে রান্নার জোগাড়ে লেগে গেল। ভাত, মাছ, মুরগী, ডুম্বার মাংসের তরকারী ডুঘণ্টার মধ্যে রান্না করে এনে হাজির করল। তাদের আদর-যত্নে সুখী হয়ে তাদের সংগেই থাকা ঠিক করলাম। কিন্তু তাদের একজন বলল, আপনি এখানে থাকলে আমাদেরই সুবিধা ; কিন্তু আপনি পর্যটক। আপনাকে আমরা নিকটেই কোন একটা হোটেলে রাখব। এবং আপনার আসার সংবাদ তুর্কীর সকল সংবাদপত্রে দিয়ে দেব।

আমি তাতেই সুখী হলাম। লক্ষ্য করলাম, এদের প্রত্যেকেরই শরীর ভেংগে গেছে। মুখের উপর এমন একটা ছাপ পড়েছে যে, দেখলেই মনে হয় এরা চোর, না হয় ডাকাত। এদের এরূপ অবস্থা হবার একমাত্র কারণ, এরা দেশে আসতে পারছে না। এরা দেশে ফিরে যাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। ফকির সেজে গা ঢাকা দিয়ে ভারতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে, ভেবে ডুএকজন কান ডুটাতে ছিদ্রও করেছিল কিন্তু তাদের সকল আশাই এখন নির্মূল হয়েছে। বিকালে যখন তাদের কাছে ফিরে গেলাম, তখন ওরা জিগ্গাসা করল, আপনি আমাদের খাদ্য খেলেন, আরক খেলেন, অথচ পুনা হতে যারা মোটরকারে লণ্ডন যাবে বলে এসেছিল তারা সবাই নিরামিষ ভোজী। এখনও কি দেশের হাওয়া বদলায় নি ?

দেশের মধ্যে কি পরিবর্তন হয়েছে না হয়েছে সে সংবাদ তাদের দেওয়া বৃথা মনে করলাম। কারণ এরা খামখেয়ালী লোক। তবে এদের প্রাণ আছে। এক কথায়, যারা প্রাণের মমতা রাখে না, তারা মানব-সমাজের পরিবর্তন মুহূর্তের মধ্যে দেখতে চায়। তারপর বুঝলাম, এই যে মসজিদটা করা হয়েছে, তা-ও হ্যাংকোর গুরুদ্বারের মতই। নামে মসজিদ, আসলে একটি আড্ডা। মনে যখন ভয়ের সঞ্চার হয়, তখনই লোকে অজানা ভগবানের শরণাপন্ন হয়। যিনি এই মসজিদ গড়েছিলেন, তিনি আর জীবিত নাই কিন্তু এই মসজিদে বর্তমানে যারা থাকে, তাদের হৃদয়ে এখনও বিদ্রোহের ভাব এবং বাহুতে শক্তি থাকায় অজানা ভগবানের শরণাপন্ন হয় নি। তারা চোর ডাকাত সেজে থাকতে রাজি নয়। এই হল এদের সম্বন্ধে আমার অভিগ্গতা কি আছে, তা জানবার আমার শক্তিও ছিল না, ইচ্ছাও হয় নি।

অনেকে আবার বিয়ে করেছে। তাদের ছেলেমেয়ে হয়েছে, তবুও এদের তুর্কীদেশের প্রতি মায়া-মমতা হয় নি। তারা রাত্রে এসেছিল আমার সংগে সাক্ষাৎ করতে। যারা এসেছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই নেশায় বিভোর ছিল কিন্তু দেশের আর সমাজের গুণে, যাই বলা হোক না কেন, এরা কেউই আবোল-তাবোল বকে নি। মদের ভেঁপসা গন্ধে বাতাস দূষিত হয়ে উঠেছিল। এরা সবাই মজুর। কথাও হচ্ছিল তুর্কীর মজুরদের সম্বন্ধেই। তুর্কীতে মজুরদের প্রতি নতুন ভাবে নতুন মতে ব্যবহার করা হয়। মজুর যে সমাজের অংগ, নতুন সরকার তা স্বীকার করেছেন এবং সেইজন্যই তাদের থাকবার এবং খাবারের সুবন্দোবস্ত করেছেন। যাদের খাবার থাকবার এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা সরকার করে, তাদের দিন মজুরী কত তার প্রশ্নই উঠতে পারে না। তুর্কীর মজুর তাই ধর্মঘট করে না, কাজ ফেলে রাখে না। কথা হল কাজ পাওয়া যায় কি না। সে ভাবনাও তাদের নাই। কাজ করুক আর না-ই করুক, ছেলেপিলে নিয়ে তাদের উপোস করতে হয় না। কারণ তুরুক সরকার জানেন, মজুররা যদি দুর্বল হয়ে যায়, তবে তো সমাজই দুর্বল হবে। সমাজ যার দুর্বল, ভাংগন তার অনিবার্য। তাই কাজ করুক আর না-ই করুক, প্রয়োজনমত অর্থ মজুরদের চুকিয়ে দেওয়া হয়। তুর্কীর মজুর-সমস্যার এমন সুন্দর ও সরল সমাধান করা হয়েছে দেখে খুব আনন্দ হল।

অনেকেই বলে থাকেন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তুর্কীতে নাই। আমি সে কথা মানতে রাজী নই। যদি ঐ মজুরদের কাছে প্রচুর মদ বিক্রী করা হত, তবে আর ওদের এরূপ অবস্থায় দেখতে হত না। এরাও মাতাল হয়ে পথেঘাটে ব্যভিচার করত, জেলে যেত ও শরীর নষ্ট করত। একে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লোপ করা বলে না, এটা হচ্ছে অসংযমের প্রতি রাশ টেনে ধরা।

তুর্কীতে যে সকল ভারতবাসীর ছেলেপিলে হয়েছে, তাদের স্কুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক। তাদের জন্য বিশেষ কোন স্কুল নাই। সর্বসাধারণের সংগেই তাদের লেখাপড়া শিখতে হয়। তাদের ছেলেপিলেদের তুর্কী ভাষা ও সংগে সংগে যে-কোন একটা ইউরোপীয় ভাষা শিখতে হয়। ইউরোপীয় ভাষা হিসাবে ভারতবাসীদের ছেলেপিলেরা ইংলিশ শেখে। কেন ইংলিশ শেখে জিগ্‌গাসা করায় ভারতীয় ভাইগণ বললেন, তাদের ছেলেপিলেরা যদি ইংলিশ শেখে তবে ভারতে ইংলিশ ভাষার সাহায্যে চিঠিপত্র লেখার সুবিধা হবে।

যে স্কুলে ভারতীয় ছেলেরা অন্য ছেলেদের সংগে পাঠ করতে যায়, তথায় আমার যাওয়ার পর সকল ছাত্রের মধ্যে এত চান্‌চল্য এসেছিল যে, তৎক্ষণাৎ স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং পর দিন বক্তৃতা দেব বলে স্বীকার করে হোটেলে ফিরে আসি। আমাদের দেশের সৎ ছেলের দৃষ্টান্ত অনেক দেখেছি কিন্তু এসব ছেলের মধ্যে ঠিক সেরূপ কিছু নেই। ওদের মধ্যে আছে উদ্দীপনা, স্বাস্থ্য ও জানবার প্রবল আকাংখা। এসব কিসে আসে তা তুর্কী শিক্ষক মহাশয়গণ বেশ ভাল করে অবগত আছেন বলেই স্কুলটি সেদিনের মত বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

পরদিন স্কুলে গিয়ে জাপানী ছেলেদের সম্বন্ধে এবং চীনের প্রগতিশীল যুবকদের সম্বন্ধে অনেক কথা বললাম। ছেলেরা কান পেতে সব শুনল। আমার মনে হল, ওরা পছন্দ করেছিল চীনা যুবক-যুবতীদের আত্মবলিদানের কথা। বক্তৃতা দেবার পর ছেলের দল নানা প্রশ্ন করতে লাগল চীন এবং জাপান সম্বন্ধে। প্রায় দু ঘণ্টা তাদের প্রশ্নের উত্তর দেবার পর শিক্ষকগণ যখন আমাকে সাহায্য করতে তাদের বললেন, তখন প্রত্যেকটি ছেলে আপন-আপন পকেট শূন্য করে লীড়া এবং ক্রোশন আমার হাতে তুলে দিল।

হোটেলে ফেরবার পথে শিক্ষক এবং ছাত্রগণ তুর্কীর জাতীয় সংগীত গাইতে গাইতে আমার সংগে এসেছিলেন। তারা হোটেলের দরজা পর্যন্ত এসেছিলেন এবং জাতীয় সংগীত গাইতে গাইতেই ফিরে যান। আমার বক্তৃতা শুনবার জন্য আমার দেশের লোক সবাই সেদিন কাজে যান নি। স্কুলের বক্তৃতা সমাপ্ত হবার পর আবার তারা মসজিদে সভা বসালেন। সর্বপ্রথম জাতীয় সংগীত 'বন্দেমাতরম্' গাওয়ার পর অনেকেই ভাবে বিভোর হয়ে কত কথা যে বললেন, তার ঠিক নাই। তারপর সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিশ্রামার্থ হোটেলে ফিরে এলাম। রাত্রে তুরুক গোয়েন্দা আমার প্রতি তার দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইতে এসেছিল। বিদেশে যদি নিজের দেশের কথা খাপছাড়া করে বলা না হয়, তবে ভারতের এবং ভারতবাসীর শত্রু এ দুনিয়ায় কেউ হতে পারে না।

রাত্র গভীর। আদানা গভীর নিদ্রামগ্ন। ইচ্ছা হল একবার সুষুপ্ত আদানা দেখে আসি। ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের পাহারা দেবার জন্য পাহারাদার নিযুক্ত। মাঝে মাঝে সেরূপ পাহারাদারদের সংগে দেখা হতে লাগল। বলতে লাগলাম, হিন্দু তোর দু-মন্দে অর্থাৎ আমি একজন হিন্দু ভূপর্যটক। কেউ কিছু বলল না।

ফিরে এসে বেশ ভাল ঘুম হল। যখন চোখ খুললাম, চেয়ে দেখি প্রভাত-অরুণের সহস্র কিরণ বাতায়ণ পথে ঝিলমিল করছে। সুনিদ্রায় শরীরটা বেশ ঝরঝরে বোধ করলাম।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে হোটেলের বারান্দায় এসে প্রবাসী দেশী ভাইগণের দেখা পেলাম। তাদের সংগে কএকটি ছাত্রও ছিল, ছাত্রদের পোশাক, মাথার টুপি একই রকমের। তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সাইকেলটা বাইরে টেনে এনে পথে এলাম। প্রবাসী ভাইদের নানা কথায় মনের ব্যথা বুঝিয়ে উত্তর দিকে রওনা হলাম। এত পরিচয়, এত বন্ধুতা নিমেষে লোপ পেল। সামনের পাহাড়ী পথ আমাকে গত কএকদিনের সকল কথা ভুলিয়ে দিল।

আদানা হইতে কাইজারী পর্য্যন্ত পার্বত্য পথ। গত যুদ্ধের সময় বৈদেশিক সৈন্য কেন যে কাইজারি পর্যন্ত পৌছতে পারে নি, তা আমি ভাল করে বুঝলাম। ৫০০০ থেকে ৭০০০ ফুট উচ্চ সংকটময় পার্বত্য দেশের মাঝ দিয়ে উঁচুনিচু পথ। এই পথে লোকের যাতায়াত খুবই কম। তবে মাঝে মাঝে পণ্টনী ঘোড়ার গাড়ি চোখে পড়ছিল। তার আরোহীরা আবার বেশী কথা বলে না। তারাও পথিক, পথের কষ্টে কাতর। যে ঘোড়াগুলি গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তারাও পরিশ্রান্ত, চলতে চায় না। এরূপ দৃশ্যও বেশীক্ষণের জন্য দেখতে পাই নি। তারপরই জনমানবের যাতায়াত নাই। আমি একদম একা।

পাহাড়ী পথে চলতে যদিও ভীষণ পরিশ্রম হয় গলা শুকিয়ে ওঠে, তবুও পাহাড়ী পথে প্রভাতে যে স্নিগ্ধ একটা হাওয়া বয়ে যায়, তা মনকে ঝরঝরে করে দেয়। দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পথ চলে একটি ছোট গ্রামে এলাম। গ্রামে কাফিখানা, খাবারের দোকান কিছুই ছিল না। গ্রামের পুরুষ সবাই কাজ করতে বেরিয়ে গেছে, আছে কতকগুলি শিশু আর স্ত্রীলোক। শিশুদের এবং স্ত্রীলোকদের পোশাক ইউরোপীয় ধরণের। স্ত্রীলোকরা এখনও ইউরোপীয় নারীদের মত অপরিচিতের সংগে কথা বলতে অভ্যস্ত হয় নি। কিছুমাত্র চিন্তা না করে একটি বাড়িতে গিয়ে একখানা চেয়ারে বসে পড়লাম। গ্রামের স্ত্রীলোক সবাই একত্রিত হল, পরামর্শ করল ; তারপর এক বাটি দই এবং একখানা রুটি আমাকে খেতে দিল। আমি খাবার খেয়ে চেয়ারটার কাছেই কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ভাবলাম আজ এখান থেকে নড়ব না। ঘুম থেকে উঠে দেখি পুরুষের দল ফিরে এসেছে। অনেকেই কথা বলল কিন্তু তাদের কথা বুঝলাম না। বিকালে বিছানা

কম্বল এবং সাইকেলটা রেখে পাহাড়ে বেরিয়ে এলাম। রাত্রে গ্রামের কএকজন লোক একটি ডিনার পার্টির বন্দোবস্ত করল। তাতে কাবাব, রুটি, শীতল জল এবং কাফি ছিল। রাত্রে ওরা আমাকে বিছানাও দিয়েছিল। প্রভাতে তারা যা খায় আমাকেও তাই খেতে দিয়েছিল। এরূপ করে মিসিম্, ওস্মানি, কোজান, কর, সিম্বেআলী, কাশিন, অনুকায় এবং ইরজিয়ম প্রভৃতি পল্লীতে রাত্রি যাপনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করতে হয়েছিল। এর মধ্যে বিশেষ কোন শহর নজরে পড়ে নি।

সাতদিন ক্রমাগত এগিয়ে চলেছি, গ্রামের পর গ্রাম পেছনে রেখে এসেছি। যখনই বিশ্রামার্থ পাহাড়ের কোলে বসতাম, ভাবতাম এই গ্রামগুলির সঙ্গে আমাদের দেশের পার্বত্য গ্রামের কি রকমের প্রভেদ আছে? প্রভেদ হল এই যে, ওদের টালি দিয়ে ছাওয়া ঘর ইউরোপীয় ধরনে প্রস্তুত, আর আমাদের পার্বত্যগ্রামের চালা ঘর হয় কাদা নয় খড় দিয়ে ছাওয়া। আরও একটা বিশেষ প্রভেদ হচ্ছে, ওদের মধ্যে যে জাতীয় ভাব আছে, আমাদের পার্বত্য অন্চলে তার একেবারে অভাব। জাতীয় ভাব শব্দটা আমরা শুনি, হয়তো জিগ্গাসা করলে তার অর্থও বলতে পারি; কিন্তু আসলে জাতীয় ভাবের অনুভূতি অনেকেরই নাই।

মুস্তাফা কামালের অনুগ্রহে বর্তমানে আর্মেনীরাও গ্রামে বসবাস করছে আর্মেনী এবং তুরস্কে চিরশত্রুতা, একথা কে না জানে? কিন্তু তুরুকরা আজকাল আর্মেনীদের আর আর্মেনী বলে পরিচয় দেবার সুযোগ দেয় না। বলে, এরাও তুরুক, তবে ওরা ধর্মে খৃস্টান। পরকে আপন করাকেই বলে জাতীয় ভাব। জাতীয় ভাব তুরুকদের মধ্যে যেমন নতুন আকারে এসেছে, ঠিক সেরূপ জাপানীদের মধ্যেও বহুপূর্বেই এসেছিল। তারই ফলে কোরিয়ার অর্ধেক লোককে জাপানীরা জাপানী করে তুলেছে। আর আমরা আপন ভাইকে পর করতে ছাড়ি না, বলি তার জাত চলে গেছে। আমরা জাতীয় ভাবও গ্রহণ করতে সক্ষম হইনি।

প্রত্যেক গ্রামেই স্কুল স্থাপন করা হয়েছে। গ্রাম ছোট কি বড় এরূপ কোন কথাই উঠে না। দুঘরের গ্রাম হোক, আর পাঁচশত ঘরের গ্রামই হোক, ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যার তারতম্য হয় মাত্র। সাত বৎসরের শিশু হতে সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই লেতিনি তুর্কী অথবা রোমান তুর্কী

শিখতে আরম্ভ করেছে। শিক্ষকগণ শুধু শিক্ষকতা করেন না, তাঁরা জেন্দআর্ম বা বা মিলিটারী পুলিশেরও কাজ করে থাকেন। এজন্যই প্রত্যেক গ্রামে জেন্দআর্ম দেখতে পাওয়া যায়। জেন্দআর্মগণ প্রায় দ্বিপ্রহরে শুয়ে থাকেন। প্রভাতে উঠে তাদের গ্রামের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার তদ্বির করতে হয়; যার অসুখ হল তার ঔষধের ব্যবস্থা করতে হয়; প্রাতে ছেলেপিলেকে শিক্ষা দিতে হয়, রাত্রে যুবকদের ও বৃদ্ধদের লেতিনি তুর্কী শেখাতে হয়। এক কথায় জেন্দআর্ম গ্রামের সর্বময় অভিভাবক। জেন্দআর্মগণ নানা ভাষায় শিক্ষিত, তাদের সাধারণ জ্ঞান আছে বলেই মনে হল—যা সচরাচর আমাদের দেশে দেখা যায় না।

আমাদের দেশে ইতর এবং ভদ্র বলে দুটা শব্দ আছে। বর্তমানে তুর্কীতে জেন্দআর্মগণ ইতর শব্দের সংগে সংগে ইতরতাকেও বিদায় দিয়েছেন—রেখেছেন শুধু ভদ্র। এদের কর্মতৎপরতা দেখে মনে হল, যদি গ্রামের উন্নতি করতে হয় তবে ডিমক্রেসী বলে চীৎকার করলে চলবে না, কারণ অনেক সময় হিপক্রেসী উচ্ছৃঙ্খলতাও ডিমক্রেসী রূপে সমাজে লুকিয়ে থেকে সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। যারা বার্ধক্যে পৌছেছে তারা স্বভাবতই বলে, বাবা, চুল পাকিয়েছি, আমাকে আর কি শেখাবে? আমার কথানুরূপ কাজ করে যাও কিন্তু এসব বাজে কথা অথবা হিপক্রেসী তুর্কীতে চলে না। তুর্কীর জেন্দআর্ম বলে, যদি আপনারা শিক্ষিত হতেন, তবে তুর্কীকে ইউরোপীয়রা সিক্‌ম্যান বলত না। অতএব আমাদের পক্কবুদ্ধির কোন মূল্য নাই। বৃদ্ধদের মধ্যেও অনেক অল্পবুদ্ধি থাকে, বয়স গ্যাণের মাপকাঠি নয়। অতএব যা বলা হয়েছে তাই করুন, না করতে পারেন অক্ষম খাতাতে নাম লেখান। কথা শুনে সবাই চুপ।

মে মাসের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এসে দেখা দিয়েছে। ছোট ছোট গ্রামের ছোট ছোট গাছগুলি আলোকের স্পর্শ পেয়ে আরও একটু আকাশের দিকে উঠে গেছে। অন্যান্য বৃক্ষরাজিও নবপত্রে সজ্জিত হয়ে পাহাড়-পর্বত এবং গ্রামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। এসব সৌন্দর্য যদিও চোখে পড়ে মনে বেশ একটা আলোড়ন তুলছিল, তথাপি পা আমার আর চলছিল না। আদানা থেকে যে শক্তি অর্জন করেছিলাম সেই শক্তি ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়ছিল। শরীর আর চলছিল না। কখনও সাইকেলে বসছিলাম আর কখনও নেমে পায়ে হেঁটে চলছিলাম। এদিকে রেল-লাইন পথের সংগে সংগে ছিল না। মাঝে মাঝে সুড়ং দিয়ে রেলগাড়ি দূরে চলে যাচ্ছিল। ইচ্ছা হচ্ছিল স্টেশনে গিয়ে রেলগাড়িতেই কিছুটা এগিয়ে

যাই, কিন্তু স্টেশন কোন্ দিকে তার নির্ণয় করতে পারছিলাম না। ডান পায়ের ভাংগা স্থানটা বেশ বেশী করেই টনটন করছিল, বাঁ পা'টা কিন্তু ঠিকই চলছিল।

একেই তো শ্রান্তি ক্লান্তিতে মৃতপ্রায়, তার উপর মাঝামাঝি রাস্তায় একবার একটি ঘটনায় আরও বিব্রত হয়ে পড়লাম। একটা উঁচু পাহাড়ের গা-কাটা আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে নামছি। কানে এল বহুদূরাগত একটা অস্পষ্ট শোঁ শোঁ শব্দ। প্রথমটা খেয়াল করলাম না। ভাবলাম, বুঝিবা বাজ পাখি কি শকুন উড়ে যাচ্ছে। শব্দটা ক্রমশ নিকটতর ও সুস্পষ্ট হতে লাগল। বাইক থেকে নেমে পড়লাম—তাকিয়ে দেখি পাহাড় দুটোর উপর দিয়ে একখানা এরোপ্লেন উড়ে যাচ্ছে। তখন আমি ব্রেক চেপে নিচের দিকে নামছিলাম। কিছু দূর গিয়েই এরোপ্লেন খানা নামল। পাহাড়ের উপর থেকে মনে হল স্থানটি খুব কাছেই, কিন্তু সাইকেলে এরোপ্লেনটার কাছে যেতে পুরোপুরি একটি ঘণ্টা লেগেছিল। যেরূপ করে পথের মাঝে এরোপ্লেন নামিয়ে একটি যুবক একটি যুবতীর সংগসুখ উপভোগে মত্ত ছিল, এমতাবস্থায় তাদের কোনরূপ বাধাবিঘ্ন জন্মানো ইউরোপীয় নিয়মমতে অসভ্যতা। ইচ্ছা করলেই সাইকেলটা এরোপ্লেনের ডানার নিচ দিয়ে টেনে নিয়ে চলে যেতে পারতাম, কিন্তু তা করলাম না—দাঁড়ালাম, কি জানি যদি যুবক আমাকে ভুল বোঝে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। কখনো আড়চোখে তাদের দিকে তাকাই, কখনো বা মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকের মাঠের সৌন্দর্য দেখি। অনেকক্ষণ পর যুবতী আমাকে দেখে ইংগিতে সাইকেল টেনে নিয়ে যেতে বলল। আমি তাই করলাম। এইভাবে তুর্কীতে ইউরোপীয় সভ্যতার নমুনার সংগে পরিচয় হতে লাগল।

আমাদের দেশে ইউরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে নানা মত। আমি এসব মতের দিকে বড় লক্ষ্য রাখি না। তবে মাঝে মাঝে অসুস্থ, অকর্মণ্য এবং বৃদ্ধদের দু একটা ঘেন্নার কথা ইউরোপ ভ্রমণকালে মনে হত বটে। তখন চিন্তা করে ঠিক করেছিলাম, এসব হল দুর্বলতার লক্ষণ মাত্র। কিন্তু এই দৃশ্য দর্শনে তুর্কীতে নারী জাতের স্বাধীনতার একটা প্রতিবিম্ব দেখা গেল। অনেকের কাছে ইহা সুদৃশ্য নয়, কুদৃশ্য। জানি না যাদের কাছে ইহা কুদৃশ্য, তাদের কাছে সুদৃশ্য কি হতে পারে।

শরীরে যদি শক্তি না থাকে, কিন্তু হৃদয়ে যদি বল থাকে, তবে শরীরকে

কিছুক্ষণ চালিয়ে নেওয়া যায়। আমিও মনের শক্তিতে শরীরকে এগিয়ে নিয়ে চলছিলাম। কিন্তু এরূপ করে আর কতক্ষণ শরীর চলতে পারে? পথ চলতে চলতে হঠাৎ চোখ অন্ধকার হয়ে এল। চট করে সাইকেল থেকে নেমে পথের পাশে বসে পড়লাম। জলের বোতলটা সাইকেলের হাতলে বাঁধা ছিল, কিন্তু সেটিকে আর হাতের কাছে পেলাম না। কতক্ষণ যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলাম তার ঠিক নাই। যখন জ্ঞান হল, জলের পিপাসা মিটিয়ে ডাইরী খুলে অজ্ঞান হওয়ার একটা ব্যাখ্যা লিখতে প্রয়াসী হলাম; মন বলে যাচ্ছিল, কিন্তু হাত না চলার জন্য তা আর লেখা হল না; লিখতে না পেরে বড়ই ক্ষুণ্ণ হলাম। ভেবেছিলাম সুবিধা পেলেই লিখব, কিন্তু যখন সুবিধা পেলাম, তখন আর মনের গতি পূর্বাবস্থায় ফিরে এল না। অনেক সময় অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনা চোখের সামনে ঘটেছে, কিন্তু যখনই লিখতে বসেছি তখনই অনুভব করেছি ভাষার দৈন্য। কলম ফেলে দিয়েছি; ভাব আর প্রকাশ করতে পারি নি।

শরীরটাকে একটু সুস্থ করে পথের পাশেই শুয়ে পড়লাম। অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ওঠার পর অনুভব করলাম খিদে পেয়েছে। রুটি বের করে যখন খেতে বসলাম, তখন আর খাবার ইচ্ছা হল না। শুধু শুয়ে থাকবার আর মাঝে মাঝে লোকালয়ে যাবার ইচ্ছা ছাড়া কোন চিন্তাই মাথায় আসে না। যখনই খেতে ইচ্ছা হয় না অথচ ক্ষুধার তাড়নায় নাড়ি জ্বলতে থাকে, তখন ধীরে ধীরে খেতে হয় ও বিশ্রাম করতে হয়, লোকালয়ের কথা মন হতে দূর করতে হয়। এসব করতে বড়ই সুবিধা হয় যখন মনকে সরাসরি দুভাগে বিভক্ত করা যায়। আমি সেদিন তা-ই করেছিলাম। মুখ বলছে খাব না, হাত মুখে রুটি উঠিয়ে দিয়ে বলছে, খেতে হবেই নতুবা চলবে কি করে? হাত একটা রুটি ধীরে ধীরে মুখে তুলে দিল। মুখ চিবিয়ে তাই পাকস্থলীতে পাঠিয়ে দিল। তারপর যখন সন্ধ্যা হল, তখন মনে ফের লোকালয়ের কথা উঠল। অন্য মন বলল, এখন নয়, একটু বিশ্রাম কর, তারপর লোকালয়ে যাওয়া যাবে। মন সর্বদাই কিছু-না-কিছু চিন্তা করতে চায়। দ্বিতীয় মনটি প্রথম মনের কাছে চীনের কথা বলতে আরম্ভ করল; বলল, কত যুবক যুবতীর মরণ তো চোখে দেখে এসেছ, তবে কেন মরণের ভয়? মরতে হয় এখানে মর, বেশ সুন্দর স্থান।

মরতে হল না। কোথা হতে একজন লোক এল। সে আমাকে হাত ধরে উঠিয়ে ইংগিতে তার সংগে যেতে বলল। তার সংগে চললাম। কাছেই গ্রাম।

সে আমাকে গ্রামে নিয়ে হাজির করল। আমার তুর্কী ভাষায় ছাপা বিগ্‌গাপন তাকে দিলে সে বেশ ভাল করে তা পাঠ করে সকলকে শুনাল। সর্বপ্রথমই লোকটি এক পেয়ালা আরব ধরণের কাফি এনে হাজির করল। আরব ধরণের কাফি আমি মোটেই পছন্দ করি না। কাফি খাবার সময় বিসমিল্লা বলি নাই দেখে লোকটির চমক লাগল। অনেক করে বুঝতে চেষ্টা করল আমি মুসলিম কি না? তার মনের কথা বুঝতে পেরে তাকে বললাম, আমি মুসলিম নই। তৎক্ষণাৎ সে বললে, কমিউনিষ্ট? আমি বললাম, হিন্দুস্থান, হিন্দুস্থানী হিন্দু। এতেও রক্ষা নাই, আকাশের দিকে আংগুল তুলে বুঝিয়ে দিল ভগবানের কথা। বললাম, হাঁ মানি। এর পর সকলেই নীরব হল। এতে তো শরীরের ক্লান্তি, তার উপর ইংগিতে ভাব প্রকাশ করা মহা মুশ্‌কিল। রাত্রি আরামেই কাটল, তবে শরীরের শক্তি মোটেই ফিরল না। ইচ্ছা হল সারাদিন শুয়ে থাকি কিন্তু এটা তো আর হোটেল নয়।

প্রভাতে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেরুতে হল। পার্বত্য পথের উপরের দিকে সাইকেল ঠেলে নেওয়াও কষ্টসাধ্য। অনেকক্ষণ চলে বেলা দশটার সময় একটি আরামদায়ক স্থান দেখে শুয়ে পড়লাম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম মনে নাই; তবে যখন ঘুম ভাংল, দেখলাম সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছে। বেশ শীত অনুভূত হতে লাগল। পথ চলা অভ্যাস, তাই এগিয়ে চললাম। চলছি তো চলছিই। লোকালয় পাব কি না তার কথা মোটেই চিন্তা করি নি। আমাকে যেতে হবে আংকারা। সেখানে গিয়ে দেখতে হবে সেই নতুন শহর, আর দেখতে হবে তথাকার পরিবর্তন। এই যে প্রবল বাসনা, তাই আমাকে টেনে নিয়ে চলছিল। যে দু-একখানা মোটরকার চলছিল, তার দিকে চাইতেও ইচ্ছা হয় নি। গাড়ির ড্রাইভার হতে সবাই পল্টনী লোক। তারা ত্বরিত গতিতে চলছে। এদের বাধা দিয়ে তাদের গাড়িতে ওঠা সহজ নয়, তাই মাঝে মাঝে যে গাড়িতে "লিফ্‌ট" পাব, সে ধারণা মন হতে একেবারে চলে গিয়েছিল।

গভীর রাত্রি। চলবার আর ইচ্ছা ছিল না তাই পথেরই পাশে আবার শুয়ে থাকার আয়োজন করছিলাম। একটু দূরে গিয়ে সুন্দর একটি স্থান বেছে নিতেই মনে হল এখানে পথের কাজের মজুর হয়তো রাত কাটিয়েছিল। রান্না করার অর্ধদগ্ধ কাঠ পড়ে আছে। স্থানটা অনেকটা গুহার মতই মনে হল। আশেপাশে এমন কোন ঘন জংগল নাই যে হঠাৎ কোন বন্য জীব খপ করে ঘাড়ে এসে

পড়বে। বেশী আর চিন্তা না করে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম যারা পথ তৈরী করেছিল তাদের কথা। চিন্তাগুলি শেষ পর্যন্ত আমার মনে এক প্রবল বিক্ষোভের সন্চার করেছিল।

যারা কষ্ট করে পথ বানিয়েছে, তাদের সামান্য দিনমজুরী ছাড়া আর কিছুই দেওয়া হয় নি। কিন্তু সমাজে মজুরের যে দান, তার যদি হিসাব-নিকাশ করা হয় তবে দেখতে পাওয়া যায়, তাদের প্রাপ্তির তুলনায় তাদের দান ঢের বেশী। পাপী ধনিকের দল ছলে বলে কৌশলে মজুরদের ঠকিয়ে বড় হয়েছে। যে প্রাণপাত করে পথ তৈরী করল, তার পথে চলার শক্তি নাই। তার শরীরে যে শক্তি ছিল তার সমস্তই পথ নির্মাণে দান করেছে। তুর্কীতে এখনও সেই ভাগ্য এবং ভগবানের দোহাই দিয়ে দুর্বল মজুরকে ঠকান হয় কি না, তাই দেখতে হবে। যদি তাই হয়, তবে তুর্কীর লোককে বলতে হবে, তোমাদের পোশাকের পরিবর্তন হয়েছে, তোমরা ইউরোপীয়ান হয়েছ, কিন্তু এখনও তোমাদের আপন দুর্বল ভাইবোনদের ঠকাবার প্রবৃত্তি যায় নি। তোমাদের এই পাপ-পথ ছাড়তে হবে। তুর্কী স্বাধীন দেশ। লোকের কিসে মংগল হয় স্বাধীন দেশে সমস্তই স্বাধীন ভাবে বলা যায়। শুধু বলা যায় না গল্প যেমন ভূতের গল্প, আলির গল্প, ফেরেস্তার গল্প। এসব গল্প বলার একদিন সময় ছিল, এখন নাই ; কারণ তুরুক জাতকে বাঁচতে হবে এই পৃথিবীর বুকের উপর। যাদের মরণ-দশায় পেয়েছে তারাই এধরণের গল্প এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আবরণে পরের অর্থ শোষণ করে নিজের উদর পূর্তির ফিকির দেখে।

প্রাতে উঠে চলেছি। সংগের রুটি প্রায় শেষ হয়ে আসছিল। সাইকেলের বাক্সে যত রুটির টুকরা ছিল, সব বের করলাম এবং ঝরনার জলে তা ভিজিয়ে পেট ভরে খেয়ে ফের রওনা দিলাম। আজ তত দুর্বলতা অনুভব করছিলাম না। বেশ হাঁটবার শক্তি ছিল। পাহাড়ে রাস্তা একেবেঁকে চলেছে। মাঝে মাঝে কএকজন পথের মজুরের সংগে সাক্ষাৎ হল। তাদের আমি সিগারেট দিলাম, কিন্তু আমাদের কারুর কাছে দেশলাই ছিল না তাই একটি লোক চকমকি পাথর বের করে আগুন ধরাল। চকমকি পাথর ব্যবহার কর ক্ষতি নাই, কিন্তু সামান্য সুবিধার জন্য বিদেশ হতে আমদানী দেশলাই ব্যবহার করবার কারও অধিকার নাই। মালমসলা তুর্কীতেই আছে, মজুরও আছে, অতএব ফ্যাক্টরী কর এবং মাল উৎপাদন কর। মজুরগণও কোনরূপ সরকারদ্রোহী কথা বলল না। তারা

ইংগিতে বুঝাল, আর বেশীদিন কষ্ট করতে হবে না। পৃথিবীর অনেক স্থানে দেশলাই পাওয়া যায় না, তা বলে হা-হুতাশ করলে চলবে না। হা-হুতাশ করে কাপুরুষ—যারা আজীবন গোলামীর অওতায় দিনপাত করছে।

বিকালবেলা মনে হল আর চলতে পারছি না। তবে কাইজারী যে আরও অনেক দূর, সে কথাটা বরাবরই আমার মনে ছিল। অনতিদূরে একটা ঘর, তা দেখেও ইচ্ছা হল না সেখানে যাই। সাইকেল থেকে নেমে পথের পাশে বসে পড়লাম। সাইকেলটা গাছের সংগে ঠেশ দিয়ে রেখেছিলাম, হঠাৎ তাও ধপাস করে পড়ে গেল। ইচ্ছা হল না সাইকেলটাকে উঠাই। কলকাতার অনেক লোক আমাকে জিগ্‌গাসা করেন, ক্যামেরা সংগে নিই না কেন? যাঁরা সখের জন্য যাত্রা করেন কলকাতা হতে বড় জোর কাশ্মীর পর্যন্ত তাঁরা হয়তো ক্যামেরা রাখতে পারেন, কিন্তু আজ যদি আমার সংগে ঐ পদার্থ টি থাকত তবে ভেংগে চুরমার হত। তারপর ক্যামেরা সংগে থাকলে বিদেশে কেউ অর্থ সাহায্য করতে চায় না। তাদের ধারণা উহা একটা অস্ত্রবিশেষ। কারণ পর্যটক বেশে অনেক গুপ্তচর বিদেশের অনেক তথ্য ছবির সাহায্যে নিজের গভর্নমেণ্টকে দিয়ে থাকে। কিন্তু আমি ভারতবাসী, আমি পরাধীন, স্বাধীনতা পাওয়াই হল আমাদের কাম্য—একথাটা বিদেশীরা বোঝে না। তারা বোঝে লোকটা বৃটিশের গোয়েন্দা।

মনে সুখ নাই। চোখ বুঁজে শুয়ে পড়লাম। আরামের সুখ-শয্যা নয়। হঠাৎ কে যেন আমার হাত ধরে টানল। চোখ খুলে দেখি একজন জেন্দআর্ম। দেখেই বললাম, "ফেটিগি, তোর তু মন্দে" অর্থাৎ ভয়ানক পরিশ্রান্ত, আমি একজন ভূপর্যটক। জল পিপাসা পেয়েছে ইংগিতে তাকে জানালাম। জেন্দআর্ম তার অফিস থেকে লস্মি তৈরি করে এনে দিলে। লস্মি খেয়ে মনে হল লাহোরের লস্মির কথা! তারপরই ধীরে ধীরে জেন্দআর্মের অফিসে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসলাম।

কথাবার্তা কিছুই হল না, জেন্দআর্ম কোথায় চলে গেল। আধ ঘণ্টার মধ্যে কফি, দই, রুটি, অর্ধসিদ্ধ ডিম একখানা ট্রেতে করে এনে জেন্দআর্ম নিজেই একখানা টেবিলের উপর রাখল। ঘরের সামনেকার দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আমাকে খেতে ইংগিত করে পেছন দরজা দিয়ে সে চলে গেল। বুঝলাম জেন্দআর্মের এ আচরণের কি তাৎপর্য। লোকের যখন পেটে ক্ষুধা থাকে তখন

খাবারের আইনকানুন সে মানে না। অন্য লোকের সামনে খাওয়া রীতিসংগত নয়, তাই সে সামনের দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল। আমি কিন্তু অন্য কথা ভাবছিলাম। যদি আজ এ অবস্থায় একটি মুসলমান কি অন্য কোন জাতির লোক কোন ছুঁৎমার্গের বিধান-মানা অতিশয় নিষ্ঠাসম্পন্ন কোন পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোকের দৃষ্টিতে পড়ত তবে তার কি গতি হত? একটু চেয়েও দেখত না। বলত, এর পূর্বজন্মের পাপের ফলে এ দুর্দশায় পড়েছে। তখন মনে হল এসব পূর্বজন্ম, পরজন্ম মতবাদ পৃথিবী থেকে তাড়াতে হবে—ডিমক্রেসী থাক কিংবা চিরতরে পৃথিবী হতে বিদায়ই নিক। খেতে বসে যখন আমার রাগ হয় তখন বেশী খেতে পারি না। ক্রমাগত নিজের দেশের পাপীদের কথা মনে হওয়ায় আর খেতে পারলাম না। একটা ডিম এবং পেট ভরে জল খেয়ে দুদিকের দরজা খুলে দিলাম। আমার মনে যেমন আগুন জলে উঠেছিল, তেমনি শরীরটাও হাপাচ্ছিল। আমার সংগে একটা ধর্ম-পুস্তক ছিল, ব্যাগ হতে খুলে তা পথের মাঝে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। মনে মনে বললাম, আর ফিলসফি চাই না, প্রচুর হয়েছে। জেন্দআর্ম ঘরে এসেই আমার দিকে না চেয়ে পথের দিকে চাইল। পরিত্যক্ত ধর্ম-পুস্তকটা কুড়িয়ে এনে ইংগিতে জিগ্‌গাসা করল, এটা কি?

কি তাকে বুঝাব? অনেক চেষ্টা করে একটা শব্দ তৈরী করলাম এবং আমার গ্রামের মৌলবীর কাছ থেকে যে ইরানী শিখেছিলাম তার ব্যবহার করতে পারায় মনে মনে গ্রাম্য মৌলবীকে ধন্যবাদ দিলাম। সেই শব্দটা হলো "কিতাবে শয়তান"। এখানে কিতাব শব্দের অর্থ ধর্ম-পুস্তক। অর্থাৎ শয়তানের ধর্ম-পুস্তক। জেন্দআর্ম সেই বইখানা কিন্তু যত্নের সংগে রেখে দিল এবং ইংগিতে তাতে আমার নাম সই করে দিতে বলল। নাম লেখলাম শুধু রামনাথ।

আমার শরীরের অবস্থা দেখে জেন্দআর্ম বলল, এই খপ্‌ খপ্‌ চপ্‌ চপ্‌। তারপর শীষ দিয়ে নিকটেই রেল স্টেশনের অস্তিত্ব জানাল। আংকারা শব্দটা উচ্চারণ করে আমাকে কতকগুলি পর্বতমালা দেখিয়ে দিয়ে বলল, আংকারা। কাগজে লিখল ৩০০ মাইল। পথের দিকে দেখিয়ে বলল, ভাল না। বুঝলাম দুর্গম পার্বত্য রাস্তা। তারপর ড্রয়ার খুলে একখানা টাইম টেবিল বের করে গাড়ির সময় দেখাল। তার হাতের ঘড়ি দেখিয়ে গাড়ির সময় বলে দিল। বুঝলাম সকল কথাই, কিন্তু আদানাতে তুর্কী ছেলেরা যে টাকা দিয়েছিল তা পথে

নিঃশেষ হয়েছে। পকেট হতে মনিব্যাগটা বের করে তার সামনে ফেলে দিলাম। মনিব্যাগ খুলে যা পাওয়া গেল, তা দিয়ে ভাড়া সংকুলান হয় না। জেন্দআর্ম অনেক চিন্তা করার পর নিজের কোট থেকে বোতামগুলি একটা একটা করে খুলে ফেলল। প্রত্যেকটি বোতাম ছিল তুর্কীর অর্ধ পাউণ্ড। বোতামরূপে যে টাকা ছিল তাই সংগ্রহ করে জেন্দআর্ম রেল স্টেশনে গিয়ে আমার জন্য আংকারার টিকেট কেটে নিয়ে এল। সাইকেলটার জন্য নিয়ে এল একখানা রসিদ।

দুজনে মিলে চললাম রেল স্টেশনে। যারা দার্জিলিংএর রেল স্টেশন দেখেছেন, তুর্কীর পার্বত্য অনচলের রেল স্টেশনগুলিও তারা অনুমান করে নিতে পারবেন। তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে তার বৈশিষ্ট্য আছে। স্টেশনে গিয়ে দেখলাম যারা গাড়ির টিকেট কিনে বসে আছেন, তাদের মধ্যে একজনেরও পুরাতন আমলের পোশাক নাই, সবাই ইউরোপীয় পোশাকে সজ্জিত।

সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল। দেখলাম তাড়াহুড়া কেউ করছে না। সবাই দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের মুখে গাম্ভীর্য প্রকাশ পাচ্ছে। গাড়ি এসে প্ল্যাটফরমে দাঁড়াল। কুলি সাইকেলটা লাগেজে নিয়ে গেল। আমার বোঝাটা জেন্দআর্মই উঠিয়ে নিয়ে আমাকে একহাতে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করল। তারপর একটা সিটে গিয়ে আমরা বসলাম। সিটে আমাকে বসিয়ে জেন্দআর্ম ইংগিতে বলল, সে একটু বাইরে যাবে, এখনই আসবে। অল্পক্ষণের মধ্যেই জেন্দআর্ম ফিরে এল, দেখলাম তার হাতে একটা রুটি এবং কতকগুলি পনির। আমার হাতে সেগুলি দিয়ে জেন্দআর্ম যখন বিদায় নেবার উদ্যোগ করল, তখন করমর্দন না করে আমি তার গলা জড়িয়ে আলিংগন করলাম। সে বোধ হয় আমার কৃতগ্গতা অনুভব করেছিল। জেন্দআর্ম মুষ্টি উঠিয়ে চলন্ত গাড়ির দিকে একটি ইংগিত করল। সেই ইংগিত আমাকে বুঝিয়ে দিলে, তুর্কীতে শুধু পোশাকই পরিবর্তন হয় নি, মনের পরিবর্তনও হচ্ছে।

---

# আংকারার বুকে

নিজের কোটের বোতাম ছিঁড়ে, তা থেকে টাকা বের করে, একটা অপরিচিত বিদেশীকে দিয়ে দেওয়া বাস্তবিকই মনে একটা বিস্ময় এনে দেয়। তবে এরকম ব্যবহার অনেক দেখেছি এবং নিজেও ঠিক সেরূপ সাহায্য অনেক দেশেই পেয়েছি। কিন্তু চিন্তা হল এই তো মাত্র গড়ন; এর মধ্যেই আবার ভাংগন ধরবে না তো? নতুন ভাংগনে অবশ্য একটা পাকা গড়নের নিশ্চয়তা আছে। এরই মধ্যে সেই প্রবৃত্তি এদের মধ্যে এসে গেছে। আতা তুরুক এখনও জীবিত, এখনও অনেক গ্রামে পুরাতন প্রথা রয়ে গেছে। এখনও তুরুকদের এমন শক্তি গড়ে উঠে নি যে, যে-কোন বৈদেশিক শত্রুর সামনে তারা দাঁড়াতে পারে।

বসে বসে ভাবতে লাগলাম, এদের এ আগুনে ঝাঁপ দেওয়া উচিত কি না। মানচিত্রে দেখেছি স্মার্নার কাছের দ্বীপপুনজ ইতালীর অধিকারে। ইতালী ইচ্ছা করলেই যে কোন মুহূর্তে স্মার্না অধিকার করে বসতে পারে উপরন্তু ইতালীর বক্রদৃষ্টি তুর্কীর উপর আছেই। ইতালী রুশিয়ার সংগে একটা মামুলী সন্ধি করেছে বটে, কিন্তু এই সন্ধির মূল্য কি? রুশিয়ার চারিদিকে শত্রু। স্ট্যালিনের সংগে ত্রতস্কির ঝগড়া হবার কারণই হল আগে দেশ সামলাও, তারপর পৃথিবী জুড়ে বিদ্রোহের আগুন ছড়াও। রুশিয়ার এখনও ঘর রক্ষার ক্ষমতা হয় নি, নতুবা সিংগোরী নদীর দ্বীপগুলি জাপানীদের হাতে একে একে ছেড়ে দেবার দরকার হত না, মান্‌চুলী হতে আন্তুং পর্যন্ত রেলপথ বিক্রি করবার কোন কথাই উঠত না। তবে তুরুক জাত এ জাতের পিঠে কলজে। ছোটবেলা হতে শুনছি, এরা শুধু লড়্‌ছেই, হয়তো আবার লড়বে, আবার মরবে, আবার শান্তি স্থাপন হবে, আর এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

গাড়ি চলেছে কোথাও প্রবল বেগে, কোথাও ধীরে, কারণ এদিকের রেলপথ পাহাড়ের গা বেয়ে চলেছে। চারদিকের পাহাড়ের সৌন্দর্য বাস্তবিকই উপভোগ্য। অনেকক্ষণ বসে পাহাড়ের দৃশ্য দেখার পর একজন তুরুক ভদ্রলোক আমার পাশের

সিটে বসে ফরাসী ভাষায় আমার সংগে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। আমি তাঁকে ইংলিশে বললাম, ফরাসী ভাষা মোটেই জানি না। তিনি ফের সুর বদলিয়ে ইংলিশে আমার সংগে কথা বলতে লাগলেন। তাঁর ইংলিশ উচ্চারণটা আমার কাছে কড়া ঠেকতে লাগল। মাঝে মাঝে তিনি আমেরিকান ধরনেও উচ্চারণ করতে লাগলেন।

আমি তাঁকে জিগ্গাসা করলাম, আপনি কি তুরুক ?

নিশ্চয়ই। তবে দক্ষিণ আফ্রিকাতে অনেক দিন ছিলাম বলেই আমার ইংলিশ উচ্চারণ ঠিক ঠিক হয় না।

হাঁ, একটু লম্বা করে উচ্চারণ করেন বলে মনে হয়।

এখন ভাষার কথা রেখে দিন, যাবেন কোথায় ?

আপাতত আংকারা। সেখান থেকে হাইদরপাশা হয়ে স্তাম্বুল যাব।

আপনি কি ভূপর্যটক ?

হাঁ, আমি বাইসাইকেলে ভূপর্যটন করি।

পথটা একটু খারাপ বটে, এদিকে সাইকেলে চলা একটু কষ্টকর। কোন কোন্ দেশ আপনি ভ্রমণ করেছেন ?

পূর্ব এশিয়া দেখে এসেছি, এবার চলেছি ইউরোপে।

এদেশ কেমন লাগছে ?

আমার কাছে তো বেশ লাগছে তবে কি না যা ভেবেছিলাম, সেরূপ এখনও কিছু দেখছি না।

আপনি কি নতুনের পক্ষপাতী ?

আমি ভবিষ্যতের বর্তমান।

ভদ্রলোক হো হো করে হেসে বললেন, প্রাতে কথা হবে, এখন ডিনারে যেতে হবে। আমি তাঁকে বিদায় দিয়ে রুটির দিকে চেয়ে দেখলাম। যাদের হাতে প্রচুর অর্থ আছে, তারাই রেল গাড়িতে ডিনার খেতে পারে। মনে মনে ভাবলাম, তুর্কীতে এমন দিন কখন আসবে, যেদিন প্রত্যেকেই রেল গাড়িতে চড়ে ডিনারের জন্য টাকার চিন্তা না করে একদম টেবিলে গিয়ে বসতে পারবে ? গরিব মজুরের বুঝি পেটপিঠ নাই, আছে শুধু মোটা পেটওয়ালাদের ? সিট হতে উঠে গিয়ে একটু জল খেয়ে শুকনো রুটি চিবোতে লাগলাম। অনেকে হয়তো ভাববে এই যথেষ্ট, ভাগ্যে আজ এই-ই ছিল ইত্যাদি। আমি ভাগ্য বলে কিছু

মানি না। তুমি যে দেশে জন্মেছ, তুমি যে স্কুলে পড়েছ, আমিও সে দেশে জন্মেছি, সে স্কুলে পড়েছি। তুমি পেলে সুপারিশের জোরে হাজার টাকা মাইনে, আর আমি পেলাম তিরিশ টাকা মাইনে। এখানে ভাগ্য বলে কিছু নাই, এখানে আছে বন্‌চনা। আমি এই বন্‌চনা ভাগ্য বলে গ্রহণ করে নিতে প্রস্তুত নই।

এরূপ চিন্তায় বেশ রাগ হয়েছিল, তাই রুটিতে শক্ত করে কামড় দিয়ে বড় বড় টুকরো মুখে দিতে লাগলাম। পনিরের কথা হঠাৎ মনে হল, পনির উঠিয়ে তা থেকেও একটা বড় টুকরো মুখে তুলে দিলাম, আর সংগে সংগে ভাগ্যের নামে গাড়িতেই পদাঘাত করলাম। পাশের লোকটি আমার এরূপ অদ্ভুত ব্যবহারে হয়তো আমাকে পাগল ভেবেছিল। ভাবুক পাগল, বয়ে গেল। যারা ভাগ্য মেনে চলে তারাই যে ঠিক পাগল, তারা কি সে কথা জানে? যারা দশের উপকারের জন্য চিন্তা করে, দশের সাহায্য করতে প্রাণ পর্যন্ত দিতে চায়, তাদেরে এই দশজনাই প্রথমে মূর্খ, পাগল ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে থাকে; আমি তো কোন ছার। অধিকক্ষণ এরূপ চিন্তায় কাটল না; চোখ ভরে ঘুম এল। বসে বসেই ঘুমোতে লাগলাম। আমার কাছে এখন আর কিছুই নাই বললেও দোষ হয় না, তাই রাত্রে ঘুমোবার জন্য বিছানা ভাড়া করতে পারি নি। আমার মত আরও কএকজন অর্থহীন ছিলেন, তাঁরাও বসে বসেই রাত কাটালেন। আমার শরীর দুর্বল থাকায় বসে বসেও বেশ ঘুম আসছিল। মাঝে মাঝে যখনই ঘুম ভাংছিল, তখনই বিশালবপু দরিদ্র তুরুকদের বসা-অবস্থা দেখে বাস্তবিকই দুঃখ হত। যে সকল লোক পুরুষানুক্রমে তুরুক জাতের মংগলার্থ যথাসর্বস্ব দিয়ে আসছে, তাদেরই আজ পুঁজিপতিরা বলছে গরিব। সে যা হোক, তুরুক জাত হয়তো সত্বরই আমেরিকার মত রেল গাড়িতে শ্রেণী-বিভাগ উঠিয়ে দিয়ে সকল বিপদ হতে রক্ষা পাবে।

গত রাত্রের তুরুক ভদ্রলোক প্রভাতেই এসে হাজির। তাঁকে নমস্কার জানাবার পূর্বেই তিনি ইংলিশে গুড মর্নিং করে বসলেন এবং তুর্কীর রেল গাড়িতে রাত্রি কেমন কাটল জিগ্‌গাসা করলেন।

আমি বললাম, আপনাদের রেলগাড়ি একেবারে জাপানী ধরনের, তাই সিটে বসে থেকে রাত কাটাতেও অসুবিধা হয় নি।

ভারতের রেলগাড়ি কিরূপ?

ভারতের রেলগাড়ির কথা জিগ্‌গাসা না করাই ভাল।

কেন ?

ওসব হয়েছে সৈন্যদের চলাফেরা করার জন্য, পাসেন্‌জারের জন্য নয়। আচ্ছা বলুন তো আংকারা গিয়ে থাকি কোথায় ?

সে ভাবনা আপনার করতে হবে না।

কেন ?

আপনাকে স্টেশন হতেই পুলিশ এসে নিয়ে যাবে এবং আপনার পকেটের টাকার অনুপাতে হোটেল বের করে দেবে।

পুলিশ এরূপ সদয় কেন ?

এরূপ সদাশয়তা আমাদের প্রতি নয়, শুধু আপনার প্রতি। হয়তো আপনি ভারতীয় ধর্মের নামে পাগল হয়ে এখানে আবার কি করে বসবেন, তাই পুলিশের একটু তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে।

আমাদের দেশের কি কেউ ধর্মপ্রচার করতে এদেশে এসেছিল ?

ধর্মপ্রচার করতে আসে নি, আতা তুরুককে হত্যা করতে এসেছিল। তারপর হতে কোন ভারতবাসীকে আর আংকারাতে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। তবে আপনার বিষয় পৃথক। আপনি নাকি ইসলাম ধর্মের লোক নন, সে জন্যই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আপনি এসব কথা জানলেন কোথা হতে ?

আমিও একজন গোয়েন্দা।

ভাল, ভাল মশাই, শুনে সুখী হলাম, আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। গোয়েন্দার সংগ বেশ ভালই। আমি তুর্কীতে এসেছি তুরুকদের সংগে শত্রুতা করবার জন্য নয়, মিত্রতা করবার জন্যই।

তা না জানলে আপনি আংকারায় প্রবেশ করতে পারতেন না। এখন বলুন টাকাকড়ি কি আছে। আপনার থাকার বন্দোবস্তটা করে দিতে পারলেই আমার কর্তব্য সমাপন হয়।

মনিব্যাগটা দিয়ে বল্‌লাম, যা আছে এতেই।

ভদ্রলোক মনিব্যাগ পরীক্ষা করার সময় দুটি তুর্কীর পাউণ্ড আপন পকেট হতে খুলে যে আমার মনিব্যাগে রেখে দিলেন, তা আমি ধরতে পেরেছিলাম কিন্তু কিছুই বলি নি।

তিনি বললেন, এ যে মাত্র ছুটি পাউণ্ড।

দুটি পাঁচটির কথা এখানে মোটেই ওঠে না। আপনি যেখানে আমাকে রেখে আসবেন আমি সেখানেই থাকব।

হাঁ, তাই হবে। এখন নিশ্চিন্ত মনে এক পেয়ালা কাফি খান, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ধন্যবাদ দিয়ে গোয়েন্দাকে বিদায় দিলাম। কিন্তু মনে মনে চিন্তা হল, আমার মত লোকের পেছনে গোয়েন্দা রাখবার দরকার কি। দেশে এবং বিদেশে এমন কোনো কাজ করি নি, যাতে করে আমার পেছনে তুর্কী-সরকার গোয়েন্দা লাগাতে পারে। গোয়েন্দার আচার-ব্যবহার দেখলে আবার গোয়েন্দা বলে মনে হয় না। দুটি পাউণ্ড এরই মধ্যে মনিব্যাগে রেখে দিয়েছেন, হয়তো কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে। মনে করলাম, দু পাউণ্ড চার পাউণ্ডে এ পৃথিবীর লোকের দুঃখ ঘোচে না। পাউণ্ড, শিলিং, ডলার, টাকাকড়ি এসবই হল পৃথিবীতে অশান্তির কারণ। অতএব এসব দিয়ে যদি লোভ দেখান হয়, তবে বড়ই ভুল করা হবে। তারপর মনে হল ভুল করেছি, ভদ্রলোক দয়া করেছেন মাত্র, এর বেশী এক্ষেত্রে আর কিছুই হতে পারে না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখছিলাম আর ঐ সব কথা ভাবছিলাম। কাফি যে কখন রেখে গেছে তা জানতেও পারি নি। হঠাৎ কাফির কথা মনে হতেই পেছনে চেয়ে দেখি এক পেয়ালা কাফি আমার কাছে হাত-টেবিলের উপর পড়ে আছে। কাফি তখন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, তবুও তা খেয়ে ফেললাম। অনেক দিন ভাল কাফি খাই নি, তাই ঠাণ্ডা কাফিও ভালই লাগল।

আংকারা আর বেশী দূর নয়। সামনের পর্বতমালা হঠাৎ সরে যাওয়ায় একটা উপত্যকার সৃষ্টি হয়েছে। পার্বত্য উপত্যকা দেখতে খুব সুন্দর, কিন্তু বসবাসের পক্ষে তেমন অনুকূল নয়। কারণ পার্বত্য উপত্যকায় জল হয় প্রচুর পাওয়া যায়, নতুবা যা পাওয়া যায় তা দ্বারা একটা শহরের লোকের পোষায় না। এই পার্বত্য উপত্যকার মাঝেই আংকারার অবস্থান। দূর থেকে শহরের দৃশ্যাবলী নয়নপথে এল। মনে হল না শহরখানা এখনও ভাল করে গড়ে ওঠে নি। গাড়ি স্টেশনে লাগবার সংগে সংগেই আমার পূর্ব-পরিচিত গোয়েন্দা এসে হাজির হয়ে বললেন, ঐ যে দুজন লোক দেখছেন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, ওদের সংগে

চলে যান। গাড়ি হতে অতি কষ্টে নেমে সাইকেলখানা লাগেজ হতে নিয়ে এসে পিঠ-ঝোলাটা তার উপর বেঁধে নির্দিষ্ট দুজন লোকের সংগে চললাম।

একটু এগিয়ে গিয়েই ডান হাতের দিকে বড় বড় হোটেল পড়তে লাগল। ডিপ্লমেট, তথাকথিত ব্যবসায়ী, পর্যটক, এ্যান্থ্রপলজিষ্ট, প্রাণিতত্ত্ববিদ, ভূতত্ত্ববিদ এসব লোক এই হোটেলগুলিতে থাকেন। পথের পাশে একজন হোটেল-বয় দাঁড়িয়েছিল, সে বোধ হয় জিজ্ঞাসা করত, এ আবার কিরূপ জীব? সংগীদ্বয় ইশারা করে তাকে কথা বলতে বারণ করল। আমরা নির্বিবাদে এগিয়ে গিয়ে আতা তুরুকের প্রস্তরমূর্তিকে ডানদিকে রেখে বাঁ দিকে ঘুরলাম। সামনেই একটি ছোট গলি, তারই উপর একটা তুরুক হোটেল। গোয়েন্দাদ্বয় আমাকে সে হোটেলে পৌঁছিয়ে দিয়ে আমার রুম ঠিক করে দিল এবং কি কি খাব তা জেনে, হোটেলওয়ালাকে যথোচিত ব্যবস্থা করতে বলে দিয়ে প্রস্থান করল।

এসব হোটেলে গরম জল পাওয়া যায় না। ইংলিশ কায়দায় এসব হোটেলকে নেটিভ হোটেল বলা চলে। পূর্বে তাই বলা হত, কিন্তু এখন আর নেটিভ হোটেল নয়, এখন বলা হয় তুরুক হোটেল। হোটেলওয়ালাকে বলে স্নানের বন্দোবস্ত করে নিয়ে স্নান করলাম এবং নিকটস্থ এক রেস্তোরা থেকে খেয়ে শুয়ে পড়লাম। শরীরে যেন ম্যালেরিয়া প্রবেশ করেছে বলে মনে হল; নতুবা এত বিশ্রামের পরও শরীর সতেজ হচ্ছে না কেন?

বিকালে দরজা খুলে দেখি একজন লোক নামাজ পড়ছে। একটু দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া দেখলাম। আমাদের দেশের লোক নামাজ পড়ে পশ্চিম দিকে মুখ করে, এরা নামাজ পড়ে দক্ষিণ দিকে মুখ করে। কিন্তু লুকিয়ে নামাজ পড়ার অর্থ কি?

কিছু না বলেই হোটেল হতে বের হয়ে একটা ঔষধ কিনে এনে আবার মানচিত্র পাঠে মন দিলাম। ইচ্ছা হচ্ছিল তুর্কী ছেড়ে পালাই। তুর্কীতে যেন এখনও পূর্বদেশের গন্ধ লেগে আছে। পূর্বদেশের গন্ধ ছাড়াতে পারলেই যেন সুখী হই। কিন্তু আরও অনেক দূর না গেলে পাশ্চাত্য সভ্যতার দর্শন মিলবে না।

বিকালে কোথাও গেলাম না। খেয়ে এসেই শুয়ে থাকতে হল। পরদিন প্রাতে কুইনিন এবং এস্পেরিন এক সংগেই খেয়ে নিলাম। খাবার পর একটু জ্বরের ভাব হল; তারপর ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যাবার পরই শরীরে শক্তি এল।

শরীরের দুর্বলতা আর আছে বলে মনে হল না, ক্ষুধাও বেশ হল। কিন্তু খাব কি? এদিকে গ্রীকদের কোন হোটেল নাই। দুএকখানা আর্মেনী হোটেল আছে, তাতে যবের রস বিক্রি হয় না। সামান্য রুটি দুধের সংগে খেয়ে নিয়ে ফের রুমে ফিরে এলাম। দিনটা কাটল বেশ ভালই। তৃতীয় দিন প্রাতে আমি নতুন মানুষ। আমার অবসাদ চলে গেছে, আংকারা দেখবার প্রবল বাসনা হল। ভাল করে বেশভূষা করে সাইকেলে গিয়ে উঠব, এমন সময় ট্রেনে পরিচিত গোয়েন্দা এসে বললেন, চলুন, পুলিশ স্টেশনে যাই।

বিনা বাক্যব্যয়ে তার সংগে চললাম। পাসপোর্ট এবং অটোগ্রাফ বই সংগেই থাকে। এরূপ অটোগ্রাফ বই সংগে থাকলে বিপদ-আপদের আশংকা কম থাকে। লোকে বুঝে, লোকটা ঠিকঠিকই পর্যটক। পর্যটকের সত্যিকারের শত্রু এ দুনিয়ায় নাই। যদি কেউ শত্রু হয়, যদি কোন রাষ্ট্র পর্যটকের সংগে বাদ সাধে, তবে ধরে নিতে হবে সেই রাষ্ট্রে ঘুন ধরেছে। পুলিশ স্টেশন একটু দূরে। পুলিশ স্টেশন যে স্থানে অবস্থিত, সে স্থানের দৃশ্য অনেকটা শিলংএর লাবানের মত।

সাইকেলটা পথের উপর দাঁড় করিয়ে রেখে অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। বেশীক্ষণ বসতে হল না। পুলিশের কর্তা ডেকে পাঠালেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি একেবারেই ইংলিশ জানেন না। ফরাসী ভাষা বোধ হয় তুর্কী হতে ভাল বলতে পারেন, কারণ দোভাষীর সংগে যখন কথা বলছিলেন তখন শুনছিলাম তিনি প্রায়ই ফরাসী শব্দ তুর্কী শব্দের সংগে জুড়ে দিচ্ছেন। কথা শুরু হল।

আপনার নাম কি?

আমার নাম রামনাথ বিশ্বাস।

আপনি কোন্ ধর্ম মেনে চলেন?

আমি যে ধর্ম মেনে চলি, তাকে বলা হয় বৌদ্ধ ধর্ম।

আপনাদের ধর্মমতে ভগবানের স্বরূপ কি?

যার কাছে যেমন।

তবুও বিশেষ কোন আইন নেই?

না, বিশেষ কোন আইন নেই। যারা বলে ভগবান নেই, আমাদের ধর্মমতে তাদেরও সমাজে স্থান আছে।

আপনি ভগবান সম্বন্ধে কি মত পোষণ করেন ?

ভগবান সম্বন্ধে আমার কোন মত এখনও ঠিক হয় নি, তবে যারা সদাসর্বদা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে, তাদের প্রতি আমার ভয়ানক ক্রোধ হয়। ধরুন, যদি একটা লোক আপনাকে অনর্থক ডাকে, তবে আপনি কি করবেন ?

তার দুগালে দুটো চড় লাগাব।

আমারও তাই ধারণা। এসব বাজে ডাকাডাকির কোন মূল্য নাই। তবে এটাকে আমি একটা চাল বলতে পারি গরিব ঠকাবার জন্য।

যেমন আপনি আমাদের দেশে এসেছেন ভূপর্যটক সেজে আমাদের ঠকাতে কেমন তা নয় কি ?

আপনারা যদি ঠকবার উপযুক্ত হন, তবে আমি না ঠকাই অন্য কেউ নিশ্চয়ই ঠকাবে। যাতে না ঠকতে হয়, তার জন্য হুঁশিয়ার হয়ে থাকুন।

হুঁশিয়ার আছি বলেই তো আপনিও গা ঢাকা দিতে পারেন নি।

আমার মত লোকের গতিবিধি লক্ষ্য করেই যদি আপনাদের হুঁশিয়ারীর একটা মান নির্ণয় করে থাকেন, তবে ভয়ানক ভুল করেছেন।

সে কি রকম ?

সর্বপ্রথম আপনাদের দেশের সংগে আমার দেশের এবং আমাদের রাষ্ট্রের এমন কোন সম্পর্ক নাই যে, আমার মত হাজার লোকের আসা যাওয়াতে আপনাদেব কোন লোকসান হতে পারে। পূর্বেই আমার ধর্মমত শুনেছেন, এতেই বুঝতে পেরেছেন আমি ইসলাম ধর্মের ধার ধারি না। অতএব আপনাদের সামাজিক উন্নতিতে আমার সুখ ছাড়া দুঃখ হবার কোন কারণ নাই। আমি শুনেছি, দুজন হিন্দু এদেশে এসেছিল মুস্তাফা কামালকে হত্যা করার জন্য, তারা মুসলমান ধর্মাবলম্বী ছিল। আমি যে মুসলমান নই, তার প্রমাণও দিয়েছি। আমার ওপর আর ভুল ধারণা পোষণ করবেন না।

আপনি মুস্তাফা কামালের সংগে দেখা করতে চান ?

না, মহাশয়।

কেন ?

না সাক্ষাৎ করাই ভাল। জানেন তো আমি মুসলমান ধর্মের লোক নই, কিন্তু টাকার মাহাত্ম্য এখনও আমার মন জুড়ে আছে। অতএব টাকার জন্য কি করে বসি কে জানে ? দ্বিতীয় কথা হল, এমন ধারা লোকদের সংগে সাক্ষাৎ না করে,

তাদের কাজের ফলাফল দেখাই ভাল। আপনাদের গ্রামান্চলের পরিবর্তন দেখেছি। প্রত্যেকটি পরিবর্তন প্রত্যেক মুহূর্তে আতা তুরুকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা এনে দিয়েছে। আরও এগিয়ে যাই, যতই দেখব আতা তুরুকের কর্মতৎপরতা, ততই বাড়বে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা।

পুলিশের বড় কর্তা আর কথা বাড়ালেন না। আমার সংগে করমর্দন করলেন। যারা উপস্থিত ছিল, সবাই করমর্দন করল, তারপর আমাকে পথের ধার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে তিনি বিদায় নিলেন। বুঝলাম, আমার প্রতি তাঁর আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এমন কিছু করে যেতে হবে, যাতে তুর্কীর পুলিশ বোঝে, ভারতবাসী সবাই ধর্মান্ধ নয়, টাকার ভক্ত নয়। বুঝেছিলাম, টাকা আমার জন্য চাঁদা রূপে আসবে, তা ফিরিয়ে দিতে হবে। টাকা এসেছিল, তা হতে মাত্র পাঁচটি পাউণ্ড রেখে বাকি টাকা ফেরত দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, পাঁচ পাউণ্ডই এখানকার দরকারের পক্ষে যথেষ্ট। আমি পুঁজিবাদী নই, আমি পথিক, অতএব বাকি টাকা সসম্মানে ফেরত দেওয়ার জন্য ভাববার মত কিছুই নাই।

সেদিনই বিকাল বেলা সিনেমা দেখতে গেলাম। সিনেমার টিকিট আমাকে কিনতে হয় নি। পর্যটকের পরিচয়-পত্র দাখিল করতেই টিকিট বিক্রেতা টিকিট ঘর ছেড়ে এসে আমাকে একটা সিটে বসিয়ে দিয়ে গেল। এখানে লক্ষ্য করেছিলাম, আমাদের দেশের টিকিট বিক্রেতা এবং বিদেশের টিকিট বিক্রেতার মধ্যে কত প্রভেদ। আমাদের দেশের সিনেমা টিকিট বিক্রেতা কাউণ্টার ছেড়ে যেতে পারে না—এটি হল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা—উপরওয়ালা কর্মচারীর আদেশ ছাড়া কোনও কাজ তার করবার অধিকার নাই। যদি করে, তবে তাকে বারবার মেয়েলী কায়দায় কৈফিয়ৎ দিতে হয়। উপরন্তু এরূপ দুঃসাহসিক কাজের জন্য টিকিট বিক্রেতার চাকরি যাবারও ভয় আছে। চাকরি যাবার ভয় আর মরণের ভয় আমাদের দেশে একই রকমের। কিন্তু তুর্কীতে চাকরি যাবার ভয় আর মরণ-ভয় এক নয়। সেজন্যই বোধ হয় কারও অপেক্ষায় না থেকে টিকিট বিক্রেতা ন্যায্য কাজ উপযুক্ত ভাবে সমাধা করেছিল।

সিগারেট ফুঁকা আমার একটা অভ্যাস। তুর্কীর সিগারেট একশটা খেলেও গলায় লাগে না, অথবা কাশি হয় না। কারণ তুর্কীতে সিগারেটে কোন কেমিক্যাল দ্রব্য ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। তামাক কেটে শুধু কাগজে

মুড়ে দেওয়ার বেশি কিছুই নয়। তামাক পাতার কটুত্ব অনুযায়ী সিগারেটের দাম ধার্য করা হয়। আশ্চর্যের বিষয়, কম কটু তামাক পাতার দাম বেশী। মিশর এবং বুলগেরিয়াতে কিন্তু তার বিপরীত। আমাদের দেশেও তাই।

সিটে বসেই একটা সিগারেট ধরালাম। অমনি পাশে-বসা লোকটি আমাকে বললেন, সিগারেট খাওয়া নিষেধ এখানে। সিগারেট নিবিয়ে দিয়ে সিনেমা দেখায় মন দিলাম। সেদিন ছিল আতা তুরুকের একটা লেকচার। যখন তিনি লেকচার দিচ্ছিলেন তখন মাঝে মাঝে কতকগুলি লোক তাঁর লেকচারে বাধা দিচ্ছিল এবং ধর্মের জয় বলে শ্লোগান দিচ্ছিল। আতা তুরুকের তখনকার মুখের দৃশ্য প্রণিধানযোগ্য। চোখ হতে যেন আগুন বের হচ্ছিল, গলার শিরাগুলো দাঁড়িয়ে উঠছিল এবং হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উপরে উঠছিল। চলচ্চিত্রে লেনিনের লেকচারও দেখেছি, তাতে প্রকাশ পেয়েছে রিজনিং শক্তির বিকাশ, মাঝে মাঝে রাগের প্রকোপ কিন্তু এখানে রিজনিং এবং রাগ একসংগে মিশেছে আদেশের সংগে। দর্শকদের মধ্যে যারা ছিলেন, আমি দেখছিলাম তাদের মুখমণ্ডলের অবস্থা। যখনই বিপক্ষের দল চীৎকার করছিল তখনই দর্শকগণ যেন রাগে গরগর করে উঠছিল। আতা তুরুকের প্রতি সর্বসাধারণের যে সহানুভূতি ছিল তারই প্রমাণ দর্শকের মুখে ফুটে উঠছিল।

যে ভদ্রলোক হলের ভেতরে সিগারেট খেতে নিষেধ করেছিলেন, সিনেমা সমাপ্ত হবার পর তিনি আমার একসংগে বের হয়ে আমার সংগে কথা বলতে লাগলেন। তাঁর পিতা আমেরিকায় ডাক্তারী করতেন, সংগে তিনিও ছিলেন। তাই আমেরিকান বলতে পারেন। আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, সিনেমায় বসে সিগারেট খেলে সিগারেটের ধোঁয়ার সংগে অনেক রোগের বীজাণু একের মুখ হতে শ্বাস-প্রশ্বাসের সংগে অন্যের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। এখনও তুর্কী দূষিত বীজাণু হতে মুক্ত হয় নি, এখনও তুরুক জাতের মধ্যে অনেক কুৎসিত রোগ এবং বদদোষ আছে; ক্রমে সবই হয়তো লোপ পাবে। ভদ্রলোক একজন যুবক, আমারই বয়সী ছিলেন। বন্ধুত্ব বেশ ভাল করেই হল। তিনি আমার হোটেলে এলেন এবং নানা কথার পর আমাকে বললেন, তিনি আগামী কাল আমাকে নিয়ে বেড়াতে বার হবেন। ভদ্রলোকের সদাশয়তায় মুগ্ধ হয়েছিলাম এবং তাঁর চলে যাবার পর অনেকক্ষণ তাঁরই কথা ভেবেছিলাম।

পরদিন প্রাতেই তিনি এলেন এবং আমাকে জিগ্গাসা করলেন আমি তাঁর

কথা তাঁর যাবার পর ভেবেছিলাম কি না। তাঁকে বললাম, তাঁর কথা অনেকক্ষণ ভেবেছিলাম।

এরূপ হবারই কথা। যাদের দেশের প্রতি টান নাই দেশের কথা ভাবে না, তারাই এরূপ করে অন্যের কথা ভাবে।

ভদ্রলোকের কথাটা শুনে একটু লজ্জিত হয়েছিলাম। বললাম, চলুন, এখন যাবেন কোথায় ?

যাব আর কোথায় ? চলুন একটা মসজিদ দেখিয়ে আনি, আপনাদের ধর্মে মতিগতি আছে, স্বর্গে যাবার প্রবল বাসনা আছে এবং মসজিদই হচ্ছে স্বর্গে যাবার প্রকৃষ্ট রাস্তা।

বেশ ভাল করে বুঝলাম, এই ভদ্রলোকও সরকার পক্ষের কেউ হবেন। নতুবা, নিজে যেচে প্রাতেই এসে হাজির হতেন না। তাঁকে বললাম, মসজিদে যেতে আমি মোটেই রাজী নই। যাব দরজির দোকানে, নাপিতের দোকানে এবং ধোপার বাড়ি। এসব হয়ে গেলে যাব বৈদেশিক অফিসে।

আর কোন কথা হল না। আমরা সর্বপ্রথম গেলাম একটা নাপিতের দোকানে। আংকারায় নাপিতের দোকান দু রকমের। একশ্রেণীর দোকান হল শুধু পুরুষের জন্য। দ্বিতীয় দোকানে গিয়ে রমণীরা কেশচর্যা করে আসেন। আমরা রমণীদের নাপিতের দোকানে অনেকক্ষণ দাঁড়ালাম। কএকজন রমণীও তথায় এলেন এবং তাদের কি করে কেশের বিন্যাশ হয়, তাই দেখলাম। সংগীকে জিগ্‌গাসা করে অবগত হলাম, এই রমণীরা সকলেই অফিসের কেরাণী। ধোপার বাড়িতে গিয়ে দেখলাম, স্টিমে কাপড় কাচা হচ্ছে এবং প্রত্যেক দোকানে জন দশেক লোক ইস্ত্রি নিয়ে কাপড় ইস্ত্রি করছে। সর্বশেষে আমরা গেলাম দরজির দোকানে। সেখানে ইউরোপীয় "কাট্" ছাড়া অন্য কোন কাটের ব্যবস্থা নাই দেখে মনে হল, আতা তুরুক ভয়ানক গ্যানী, তিনি গোড়ায় আঘাত করেছেন। ইউরোপীয় পোশাক ছাড়া সেখানে কিছুই পাওয়া যায় না, তাই বাধ্য হয়ে ইউরোপীয় পোশাকই পরতে হয়। এসব স্থান দেখার পর সংগী বল্‌ল, এসব স্থান দেখে আপনার কি মনে হল ?

স্টিম লণ্ড্রিতে কাজ হচ্ছে দেখলাম। ধোপা-শ্রেণী বলে তুর্কীতে যে এক শ্রেণীর লোক ছিল, এতে তারা লোপ পাবে। নাপিতের দোকান দেখে মনে হল, এসব নাপিতের দোকানে শুধু ইউরোপীয় ধরনেই ক্ষৌরকর্ম হতে পারে।

দরজির দোকানে দেখলাম শুধু ইউরোপীয় ধরনেই কাপড় কাটা হচ্ছে। আরব ধরনে পোশাক তৈরি করতে হলে যেতে হবে দামাস্কাস নয় বেরুদ।

আপনি দেখছি একদম ইউরোপভক্ত?—তিনি প্রশ্ন করলেন। আমি ইউরোপের ভক্ত নই, আমি দরকারের ভক্ত। আপনাদের দেশের একদিকে রাশিয়া, অন্যদিকে ইউরোপ। রাশিয়া নূতন মতে, নূতন পথে চলেছে, এই পথ যে পৃথিবীর ভবিষ্যতের বর্তমান তা যার চোখ আছে সেই বোঝে। তার ঝুঁকি যে আপনাদের গায়ে এসে পড়বে না, তা অস্বীকার করলে চলবে না। দুইটি পরিবর্তনশীল দেশের মাঝে বেঁচে থাকতে হলে আপনাদেরও পরিবর্তন করা সমূহ দরকার।

সাথী আমার কথার তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলেন বলেই মহানন্দে সেইদিনই বিকাল বেলা তুর্কীর বৈদেশিক অফিসে আমাকে নিয়ে যান। সেখানে আমি কারও সংগে সাক্ষাৎ করি নি, শুধু বাড়িগুলি দেখে এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেই ফিরে আসি। তুর্কীর সাংবাদিক আমেরিকান ধরনের নয়, অথবা অন্যান্য ইউরোপীয় প্রথায়ও ওরা চলে না; তারা বাস্তবিকই স্বাধীন। তবে তাদের মধ্যে একটা পরাধীনতা আছে, সেটি হল—তারা কোন ধর্মসম্পর্কিত বিষয়ে বিশেষ তোড়জোর করে কথা বলতে পারে না। আমাকেও তারা প্রথম প্রথম বোধ হয় ভেবেছিলেন "তারিখ" অথবা "ছাইয়া দুনিয়া"। তারিখ মানে যারা ইতিহাস লিখেন ও ছাইয়া দুনিয়া যদিও ভূপর্যটক বুঝায়, কিন্তু তার সরাসরি মানে হয় "মুসাফির"—যিনি ধর্মের ইতিহাস লেখেন। কিন্তু সাথীর কাছ থেকে যখন অবগত হলেন আমি ধর্মের ইতিহাস লেখক নই, নতুনের ইতিহাস লেখক, তখন তাঁরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। তাঁদের মুখে হাসি ফুটে উঠল। নানারূপ কথা হল। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, বলতে পারেন এই পৃথিবীতে কি এমন কোনও ধর্ম আছে, যাতে ভগবানের পূজা করতে হয় না, ভগবানকে মানতে হয় না?

হাঁ, নিশ্চয়ই আছে।

সে কি ধর্ম মশায়? আমরা সবাই সে ধর্ম গ্রহণ করব।

সেই ধর্মের নাম বৌদ্ধ ধর্ম। ভগবানের নামধাম নেই; যার নামধাম নেই, তার পূজা হয় কিসে?

বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আমার বিশেষ কোন অভিগ্‌গতা নাই। তবুও শোনা

কথা যা জানতাম, তাই তাঁদের কাছে সম্পূর্ণভাবে বলে এসেছিলাম। সাংবাদিকগণ আমাদের পানাহারের বন্দোবস্ত করেছিলেন এবং আমার আসার সংবাদ তুর্কীর সর্বত্র প্রচার করেছিলেন। রয়টারের এবং আমেরিকার প্রেসের দুজন প্রতিনিধি তথায় হাজির ছিলেন, তাঁরা শুধু তাঁদের গাম্ভীর্য বজায় রেখে সময় কাটিয়ে দিলেন। আমার অস্তিত্ব তাঁরা গ্রাহ্যও করেন নি, আমিও তাঁদের অস্তিত্বকে অবগ্‌ণা করেছিলাম।

সারাদিন উঁচু নিচু পথ হেঁটে পরিশ্রান্ত হয়েছিলাম। বিকালে সাথীর বাড়িতে এসে আমেরিকান খাদ্য খেয়ে, তৃপ্ত হয়ে হোটেলে ফিরেছিলাম। এতদিন হোটেলের মালিক আমার সংগে কথা বলতে সংকোচ বোধ করতেন, কিন্তু আজ নিজেই নিতান্ত আপন জনের মত আমার সংগে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। অনেকক্ষণ শুধু হুঁ হাঁ করে কাটিয়ে ইংগিতে বললাম, সাথী এলে পর কথা হবে। সাথী যখন এলেন, তখন হোটেলের মালিক অন্য কাজে চলে গেছেন, কথা আর তাঁর সংগে হল না। আমরা রুমে বসে বসে তুর্কীর কি করে পরিবর্তন হচ্ছে, তারই কথা আলোচনা করতে লাগলাম।

আতা তুরুক বুর্জোয়া ধরনের লোক, ইউরোপের লোক সাধারণত একথাই বলেন। কিন্তু তুর্কীর নবীনের দল তা মানতে রাজী নন। প্রত্যেকটা রাষ্ট্রই এক শ্রেণীর লোক দ্বারা শাসিত, এবং সেই শ্রেণীর লোক স্বভাবতই মুষ্টিমেয়। অতএব মাইনরিটি সকল সময়ই ম্যাজরিটির উপর প্রভুত্ব করে আসছে, যদিও রাশিয়ায় কমিউনিজম প্রবর্তিত হবার পর বলশেভিকরাই মেনশেভিকদের প্রতিপত্তি মেনে চলে নি। আতা তুরুক সর্বসাধারণের প্রতিনিধি, না মুষ্টিমেয় লোকের প্রতিনিধি—তাই ছিল আমার গ্যাতব্য বিষয়। জানতে পেলাম, আজ আতা তুরুক মুষ্টিমেয় লোকের প্রতিনিধি মাত্র, সর্বসাধারণের নন। কিন্তু সর্বসাধারণ এতদিন চলেছিল পুঁজিবাদীদের ইংগিতে। তাদের শিক্ষা ছিল না, ভালমন্দ বিচার করবার ক্ষমতা ছিল না; তাই মুষ্টিমেয় লোকের নায়ক সমষ্টিকে সৎপথে আনবার জন্য যে জোর-জুলুম করেছেন, কিম্বা কালক্রমে করতে বাধ্য হবেন, সেজন্য মাথা ঘামাতে নাই। কিন্তু দেখতে হবে এই মুষ্টিমেয় লোক অর্থাৎ আতা তুরুক এবং তাঁর অনুচরগণ সব সময় নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা রাখতে চান কি না? যদি সেরূপ তাঁদের ইচ্ছা থাকে, তখনই বুঝতে হবে, সেই মুষ্টিমেয় লোক এবং তাঁদের প্রতিনিধি ডিকটেটর ছাড়া

আর কিছুই হতে পারেন না। আতা তুরুক সে পথের পথিক নন, তিনি তুর্কীর প্রেসিডেন্ট মাত্র। তিনি চান, সর্বসাধারণ তাদের ভুল বুঝে শিক্ষার গুণে উন্নতি করুক, এবং শেষ পর্যন্ত মাইনরিটি এবং ম্যাজরিটি এক হয়ে যাক। এ সব কথা আমার নিজের কথা নয়, আমার সাথীর। সত্যি বলতে কি, এত দূর তলিয়ে দেখার লোক আমি নই। তিনি আরও বলেছিলেন, দুরকমে পতিতোদ্ধার হয়। তুর্কী যে পথে উদ্ধার পেয়েছে, সেই পথ বড়ই দুর্গম। কিন্তু তুর্কীর সে পথ বেশী কণ্টকাকীর্ণ ছিল বলেই আতা তুরুক মুষ্টিমেয় লোক হাতে রেখে এত বড় রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে পেরেছেন। দ্বিতীয় পথ হল—সাধারণকে জাগিয়ে সাধারণের সাহায্যে সাধারণের প্রাপ্য আদায় করে নেওয়া—ঠিক যেমনটি হয়েছে রাশিয়ায়।

আমি বললাম, আপনাদের দেশে কি অর্থনীতির দিক দিয়েও রাশিয়ার পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে বলে মনে করেন?

নিশ্চয় হবে, হতেই হবে। নতুবা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে না। এরই মধ্যে মজুরেরা দল গঠন করে তাদের দাবী জানাচ্ছে, চাষী তাদের পরিশ্রম-জাত দ্রব্যের দাম বাড়াবার জন্য এবং উৎপাদন যাতে বেশী না হয় সেদিকে প্রয়াসী হয়েছে, তা কি আপনি বুঝেন নি?

না, আমার সেরূপ সুযোগ হয়ে উঠে নি। মাঠগুলি খালি পড়ে আছে। কৃষিকর্ম যদি এসব মাঠে করতে হয়, তবে অশ্বের পরিবর্তে ট্রাকটর চালানই দরকার মনে হল। বিগ্‌গানসম্মত যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়া এসব নীরস মাঠে রসের সন্‌চার হবে না।

তাই যদি করতে হয়, তবে আমাদের সমবেত ভাবে কৃষিকার্য চালাতে হবে। সে সময় এখনও আসে নি।

সাথীর কথা হতে বুঝতে পারলাম, আমেরিকান ধরনেই তাদের কৃষিকর্ম চলছে। উৎপাদন-শক্তিকে হ্রাস করে, অল্প জিনিষ দিয়ে বেশী টাকা আদায় করা বর্তমানে কৃষকদের উদ্দেশ্য, কিন্তু তার পরিণাম ভাল নয়। টানাহেঁচড়ায় থেকে জাতের গড়ন হয় না, ভাংগন বাড়ে। সাথীর মনে দুঃখ হবে বলে তা বলি নি। তবে বার বার বলেছি, অবস্থা বুঝে চলতে হবে। উত্তরে রাশিয়া একথা সর্বদা মনে রাখতে হবে, আর মনে রাখতে হবে আর্মেনীদের প্রতিহিংসা। হিংসায় প্রতিহিংসার পরিসমাপ্তি হয় না। প্রতিহিংসাকে সাম্যের সোহাগে ভাসিয়ে দিতে হবে।

আমার কথায় সাথীর মন উঠল না দেখে বলতে বাধ্য হয়েছিলাম, জাতীয়তা-বাদকে অপদস্থ করতে হলেই ইন্‌টার-ন্যাশন্যালিজমের দরকার। একটা ধর্মের দৌরাত্ম্য যখন চরমে উঠে, নূতন আর একটা ধর্ম অনেক সুযোগ সুবিধা এনে দিয়ে কি পুরাতনটাকে লোপ করে দেয় না ?

রাত্রি অনেক। সাথীর চোখে ঘুম জড়িয়ে এসেছিল। তিনি বিদায় নিলেন, আমিও শান্তির ক্রোড়ে নিজেকে ঢেলে দিলাম। রাত্রে তন্দ্রার মধ্যে আবোল-তাবোল বকেছিলাম বলে হোটেলের মালিক দুএকবার দরজায় ধাক্কা দিয়েছিলেন এবং মাঝে মাঝে কাফের শব্দটা বিরক্তির কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন। তাদের ধারণা, ঘুমের ঘোরে যাদের প্রলাপ হয়, তারা ভূতাশ্রিত। কিন্তু অজীর্ণতা যে তার কারণ, সে সংবাদ রাখতেও তারা ভয় পান।

আংকারার দ্রষ্টব্যস্থান বলে এখনও কোন পদার্থ গড়ে ওঠে নি। মাত্র একটা স্ট্যাচু হয়েছে, আতা তুরুকের। স্ট্যাচু মিউজিয়াম দেখে সমসাময়িক অবস্থার একটা ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু বর্তমানের ছবি নেওয়া দুষ্কর। তাজমহল দেখে যদি ভারতের বর্তমানের নির্দেশ করতে হয়, তবে মারাত্মক ভুল হবে। সেইজন্যই আংকারার বাড়িঘরের প্রতি আমি তত লক্ষ্য করি নি। যে কএকটা বৈদিশিক অধ্যুষিত হোটেল আছে, সেখানে মাঝে মাঝে বেড়াতে গিয়ে পর্যটকগণের শুষ্ক মুখের আমোদ দেখতাম। যারা "ডিপ্লোমেটের" কাজ করেন, তাঁদের মানসিক অবস্থা বাস্তবিকই আশ্চর্য রকমের। মনের ভাব গোপন রেখে তাঁরা স্বাভাবিক লোকের মতই হাসছেন, খেলছেন, আমোদ করছেন। ভাবলাম এরূপ অভিনয় আমার দ্বারা সম্ভব হবে কি ? নিশ্চয়ই না। সাথীর কল্যাণে আংকারায় ডিপ্লোমেটদের চলাফেরা বেশ ভাল করেই লক্ষ্য করেছি। বিদেশে, বিশেষ করে আংকারায়, সে সুযোগ প্রায় লোকেরই হয়।

তুর্কী সরকার ডিমক্রেসীর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। অন্যান্য দেশের মত চালবাজী করে মামুলী বিষয়কে বড় করে, তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ি করতে রাজী নন, তা থামাবার জন্য যেখানে চুপ চুপ বেশী। যেখানে আভিজাত্যের ভাব প্রবল, সেখানেই আপন লোকের সর্বনাশের পথ খোঁজা একটা মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তুরুক জাত সে পথের পথিক নয়। তরুণ তুর্কীর নায়ক আভিজাত্য ভাবকে ঘৃণা করেন, সেজন্যই তাঁকে সাধারণ অফিসারদের একসংগে সাধারণ

কাফেতেও পাওয়া যেত। সেরূপ অবস্থায় তাঁকে পাবার সুযোগ একদিন হয়েছিল। আমি সে সুযোগের সদ্ব্যবহারই করেছি, অসদ্ব্যবহার করতে প্রবৃত্তি হয় নি। আমাদের দেশে সুযোগের সদ্ব্যবহার মানেই হল কিছু আদায় করে নেওয়া। আর তুর্কীতে সুযোগের সদ্ব্যবহার মানেই হল সুযোগকে অবহেলা করা। তাই আতা তুরুককে দেখেও অন্য কাফেতে চলে গিয়েছিলাম। সাথী তাতে সুখীই হয়েছিলেন বলে মনে হয়েছিল।

সাথীর সংগ ছেড়ে দিয়ে একাকী বেড়াতে লাগলাম। সর্বপ্রথম আংকারা হতে হাইদরপাশার পথটা দেখে এলাম। পথের পাশেই কতকগুলি মুদির দোকান। দোকানী দাঁড়িয়ে কাজ করছে না। আরব ধরনে ( অথবা আমাদের দেশের বেনিয়া ধরনে ) বসে বসে জিনিস বিক্রি করছে। পরনে তাদের লম্বা প্যাণ্ট, গায়ে তাদের কোট, গলায় নেকটাই, মাথায় নাইট ক্যাপ। অথচ বসে বসেই কারবার চালাচ্ছে। দোকানের গড়ন কিন্তু ইউরোপীয় ধরনের। মনে হল পুরাতন আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করতে পারছে না বলেই এরূপ করে বসে বসে বিক্রি করছে।

আংকারাতে যত যুবক-যুবতী দেখলাম, তারা সকলেই একদম ইউরোপীয়ান হয়ে গেছে। ইউরোপীয় ধরনের কথা বারবার বলছি, কিন্তু সেই ধরনটা যে কি, তা একবারও বলি নি। বলতে হলেই পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হবে। অনেকে কলকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বের ইউরোপীয়ানদের চালচলন দেখে মনে করেন, ওটাই ইউরোপীয় সভ্যতা। তা নয়। ওটা হল ইউরোপীয় ইমপিরিয়্যালিষ্ট সভ্যতা। শাসকজাতি কখনও কি নিজের দুর্বলতা শাসিতদের কাছে প্রকাশ করে? একটা দৃষ্টান্ত দিই, তাতেই বুঝবেন বৃটিশ সভ্যতা ভারতে এবং গাওয়ার স্ট্রিটের ভারতীয় ছাত্রমহলে কেমন করে প্রবেশ করেছে। দ্বিপ্রহরের খাদ্যকে আমরা সাধারণত ইংলিশে বলে থাকি লান্‌চ, কিন্তু ইংলণ্ডের সাধারণ লোক দ্বিপ্রহরের খাদ্যকে বলে ডিনার। লর্ড, পিয়ার, আর ধনী ব্যবসায়ী যাঁরা তাঁরাই শুধু দ্বিপ্রহরের খাদ্যকে বলেন লান্‌চ। আমাদের দেশে এসেছে উচ্চশ্রেণীর সভ্যতা। উচ্চশ্রেণী সমষ্টির নয়।

তুর্কীর মধ্যে এতদিন ইউরোপীয় সভ্যতা যে প্রবেশ করতে পারে নি, তার একমাত্র কারণ হল—মোল্লাইজমের প্রাধান্য। যতদিন সুলতান ছিলেন, ততদিনই মোল্লাইজম থাকতে পেরেছিল। বর্তমানে সুলতান আর নাই, সংগে

সংগে মোল্লাইজমও তুর্কী হতে অদৃশ্য হয়েছে। মোল্লাইজম চলে গেছে আনন্দের কথা, কিন্তু কি করে ভারত হতে ব্রাহ্মনিজম চলে যাবে তা বিবেচ্য বিষয়। আংকারার পথে পথে মাথা নত করে যখন বিকালে ধীর পদক্ষেপে ব্রাহ্মনিজমের কথা ভাবছিলাম, তখন সাথী পেছন দিক হতে এসে বললেন, কি ভাবছেন ?

ভাবছি নিজের দেশের কথা।

হঠাং যে দেশের কথা মনে পড়ে গেল ?

আমি ভাবছিলাম, আপনাদের মধ্য হতে যেমন মোল্লাইজম চলে গেছে, আমাদের মধ্যে তার চেয়েও খারাপ একটা ইজম আছে, তাকে কি করে তাড়ানো যায় ?

সেতো সামান্য কথা। রাষ্ট্রের উন্নতির সংগে সংগে যত দূষিত "ইজম" আছে তা আপনি বিদায় নেবে। রাষ্ট্রের উন্নতির চেষ্টা করুন, সকল রোগের সমাপ্তি হবে। সাথীর কথায় আনন্দ হল। সাথীকে নিয়ে সারা বিকাল ভ্রমণ করে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রুমে এসে সাইকেলের অবস্থাটা দেখে নিলাম। সাইকেল ভালই। অনেকক্ষণ বসে বসে সাথীর কথা ভাবছিলাম। এমন সময় সাথী এসে ফের হাজির হলেন। বললেন, প্রাতে যাবার বেলা যেন তাঁর মাতাপিতার সংগে দেখা করে যাই। আমি তাতে রাজী হলাম।

বিদেশে যারা বন্ধুত্ব করেছেন তারা বেশ ভালভাবেই অবগত আছেন যে বন্ধুত্বের দৃঢ়তা কত দূর হয়। কিন্তু মনে হল আমার উদ্দেশ্যের কথা। উদ্দেশ্য স্নেহ, দয়া, ভালবাসার ধার ধারে না। সকল সময় বলে দেয় এগিয়ে চল। তাই পরদিন সাথী এবং সাথীর মাতাপিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাইদরপাশার দিকে রওনা হয়ে গেলাম। বিদায়ের বেলা সাথী বলেছিলেন, মনে রাখবেন একটা কথা। সেই কথা শুধু—সাথী। সাথীর অনুরোধ এখনও মনে আছে।

# স্তাম্বুলের পথে

আংকারা ছেড়ে কএক মাইল যাবার পরই পথের অবস্থা বদলে গেল। পথের উপর এস্‌ফাল্‌থ্‌ নাই। গ্রেনাইট-এর উপর গ্রেভেল দিয়ে গতানুগতিক ভাবে পথ করে রাখা হয়েছে। পথের দুপাশে বহুদূর বিলম্বিত পর্বতমালা। জাপান ভ্রমণ করে এসেছি বলেই সাথীকে জিগ্‌গাসা করি নি, আংকারার জল কোথা হতে আসছে। কারণ জাপানে জল কোথা হতে আসছে জিগ্‌গাসা করা মহা-অন্যায় কাজ। জাপানীরা হয়তো ভাবে যারা এসব তথ্য জিগ্‌গাসা করে তারা নিশ্চয়ই গুপ্তচর। জাপানে পানীয় জলের অভাব বলেই এরূপ চিন্তা করতে ওরা বাধ্য হয়। এখন উপত্যকার নিচের দিকে চলেছি। তাই সুযোগ পেয়ে পেছন দিকে চেয়ে দেখলাম বহু দূরে ড্যাম্প করা হয়েছে। ড্যাম্পেই জল রাখা এবং পরিষ্কার করা হয়। কিন্তু ইহার আকৃতি দেখে মনে হল, যে-অনুপাতে শহর বেড়ে চলেছে, সেই অনুপাতে যদি আরও বাড়ে, তবে এই ড্যাম্পের জলে কুলোবে না।

ড্যাম্প দেখে নিয়ে এগিয়ে চললাম। কতক্ষণ যাবার পরই চড়াই শুরু হলো। চড়াইটা হেঁটে চলতে লাগলাম। আজ শরীরে তত দুর্বলতা নাই। যতই এগিয়ে যেতে লাগলাম ততই ক্ষুধা বাড়তে লাগল। সামান্য রুটিও আজ অমৃতবৎ বোধ হতে লাগল। বুঝলাম শরীরে জ্বর নাই, পূর্বে রোগ থাকার দরুণই এরূপ কষ্ট পেতে হয়েছিল। অনেক সময় ম্যালেরিয়া ওৎ পেতে বসে থাকে। যেই শরীরকে দুর্বল দেখে, অমনি আক্রমণ করে। হোমা নামক স্থানের মশা বিষাক্ত। হোমাতে মশা কামড়েছিল। ফলে, কাইজারী পর্যন্ত যেতে আমায় প্রাণান্ত হতে হয়েছিল।

আজ আমার মন ভাল। মন ভাল থাকলে, শরীরে তেজ থাকলে, গান আপনি মুখ হতে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু গান গাইবার ইচ্ছাকে চেপে রাখলাম। কেন গান গাইব? শরীরের স্ফূর্তি গানে ঢেলে দেব না, শরীরে স্ফূর্তি যদি থাকে তবে দেশের চিন্তায় ঢেলে দেব। আমাদের দেশের যে দুরবস্থা সে কথাই ভাবব —আর ভাবব অপর দেশের বিকশিত অবস্থার কথা। আমাদের মত লোকের

হাসা উচিত নয়; কেঁদে সময় কাটানও উচিত নয়। হাসি-কান্না দূরে রেখে দেশের চিন্তায় ও কাজে জীবন উৎসর্গ করাই আমাদের কাম্য।

আজ আমি যেখানে যাব সেই স্থানের নাম আয়াস। কিন্তু আয়াসে যেতে এত চড়াই উৎরাই আসতে লাগল যে আয়াস যাওয়া সত্যিই আয়াসসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

এ দিকের পথের দু'পাশ পাইন বৃক্ষে শোভিত। যখনই পরিশ্রম হতে লাগল, পাইন বৃক্ষের নিচে গিয়ে বসতে লাগলাম। পথে অনেক সংগীও পেয়েছি। যতক্ষণ চড়াই পায়ে হেঁটে চলেছি, ততক্ষণই সংগীর সংগে ইংগিতে বাক্যালাপ করেছি। যে ঢালু পেয়েছি, অমনিই সংগীকে গুড বাই বলে সাইকেলে চড়ে বসেছি। তুর্কী হতে ফ্রান্স পর্যন্ত সংগীরা প্রায়ই স্নেহ এবং দয়া দেখিয়েছে। ইংল্যাণ্ড যাবার পর অনুভব করেছি, আমাদের মুখের ইংলিশ শুনে খাস ব্রিটিশরা সুখী হতে পারে না। সেজন্য আমি ইংল্যাণ্ডে এমন কি ফ্লিট স্ট্রিটের সাংবাদিকদের সংগেও দোভাষীর সাহায্যে কথা বলে যে সম্মান পেয়েছি, সোজা কারও সংগে ইংলিশ বলাতে তেমনটি পাই নি। অবস্থা বুঝতে পেরে ব্রিটেনে ইংলিশ বলি নি।

আয়াসের পথে কতকগুলি যুবকের সংগে দেখা হয়। তারা মোটর বাইক করে আংকারা চলেছে। প্রথমে তারা ভেবেছিল আমি আরব। ভাবতে পারে ওরা আমি আরব, কিন্তু সাইকেলটা ভাল করে দেখেও যখন তাদের ভ্রান্ত ধারণা গেল না তখন তারা আমার সংগে কথা বলতে প্রয়াসী হল। তাদের কথার আমি জবাব দিই নি। এতে অনেকেরই মন ক্ষুন্ন হয়। একজন আরবের পক্ষে এরূপ চুপ করে থাকা একটা স্পর্ধার বিষয় জেনে তুর্কী ভাষায় দু একজন জিগ্গাসা করল, কথা বলা হচ্ছে না কেন? একটু উচ্চৈঃস্বরেই বললাম, আমি আরব নই—হিন্দু। যেমনি তাদের কানে হিন্দু শব্দটা পৌছল, অমনি তাদের মনের ভাব বদলে গেল। পকেট হতে আমার একখানা কার্ড বের করে তাদের পাঠ করতে দিলাম।

আমার জানা ছিল পূর্বে তুরুকরা আররদের প্রতি কি ব্যবহার করত, এবং বর্তমানেও তারা আরবদের সমশ্রেণীর লোক বলে গণ্য করে না। একদা তুরুক জাত আরব জাতের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিল। এখনও তুর্কীর যুবক-যুবতীদের মনে সেই ধারণা রয়ে গেছে, তাই আরবগণ এখনও তুরুকদের কাছে হেয়। তুরুকগণ

সাধারণতই বলে থাকে আরবগণ অবিশ্বাসী এবং বিশ্বাসঘাতক। যখন এসব কথা আমার সামনে বলত তখন আমি আরবের হয়ে সর্বদাই প্রতিবাদ করেছি। আরবরা স্বাধীন হবে, আপন দেশ নিজেরা শাসন করবে, আপন ভালমন্দ আপনি বুঝবে—এতে বিশ্বাসঘাতকতার কি আছে? যারা প্রগতির পথে চলেছে তারা অন্যের প্রতি সংকীর্ণ ভাব পোষণ করবে তা সমর্থনের অযোগ্য। বিশেষত, আমাকে আরব বলার জন্য আরবদের প্রতি আপনা হতেই যেন একটা সহানুভূতি এসে পড়েছিল। যারা পদদলিত ঘৃণ্য তাদের দিকে আপনা হতেই আমার মন ঝুঁকে পড়ে।

আংকারাগামী যুবকগণ নিঃশব্দে একে একে উঠে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে আমি অন্যদিকে চেয়ে রইলাম, ইচ্ছা হল না বিদায়ের বেলা হাত নেড়ে এদের কিছু বলি, কারণ এদের সাম্রাজ্যগর্ব আমার অন্তরে আঘাত করেছিল। তুমি তুরুক হও, আরব হও, যে-হও সে-হও, তোমার মধ্যে যদি অপরকে ঘৃণা করার প্রবৃত্তি থাকে তবে তোমার সংগে আমার সম্বন্ধ খুবই কম। এই অহংকারী যুবকগণ এখনও বুঝতে পারছে না, তুর্কীর অবস্থা কি, কার অনুগ্রহে এখনও তুর্কী স্বাধীন?

সামনেই একটা বড় পাহাড়, তারই উপর আমাকে চড়তে হবে। পাহাড়ের উচ্চতা আমাকে তুরুক যুবকদের কথা ভুলিয়ে দিল। আমি পর্বতের দিকে রওনা হলাম। তিরিশ হতে পঁয়ত্রিশ মাইল পথ আমাকে চলতে হবে, কিন্তু পার্বত্য পথ বলে এই সামান্য পথ চলতেই সময় কেটে যাচ্ছিল হু হু করে। আজ আমার কাছে সময়ের মূল্য ভয়ানক মনে হতে লাগল। তুর্কীর এখনও কিছুই দেখি নি, আমাকে শুধু তুর্কী দেখলে হবে না, সমুদয় পৃথিবী দেখতে হবে। আমাকে নানা রকম অভিগ্‌গতা লাভ করতে হবে। আমার দেশের লোককে তাই জানাতে হবে।

তৎক্ষণাৎ মনে হল, আমি কে? আমার অভিগ্‌গতার কি কোন মূল্য আছে? এই ভারতে কত বিদ্যান লোক আছেন, তাঁদের অভিগ্‌গতা কি কম? লোকে তাঁদের কথা শুনে না কেন? হঠাৎ মনে হল, যাঁরা গ্যানী তাঁদের অভিগ্‌গতা কোন্‌ ধরণের তা তো একদিনও ভেবে দেখি নি। তাঁরা কি তাঁদের বিদ্যা বুদ্ধি ঠিক ঠিক ভাবে ব্যক্ত করতে পারেন? আমার যা অভিগ্‌গতা হবে তাই আমি লিখব। যার দরকার হয় সেই তা পাঠ করবে।

সাইকেল ঠেলে পাহাড়ের উপর উঠতে উঠতে মুখ দিয়ে ঘন ঘন শ্বাস বইছিল। দ্বিপ্রহরের পূর্বেই আয়াস পৌছলাম। পনর মাইল পথ শুধু ব্রেক চেপেই নামতে হয়েছিল, সেজন্যই শীঘ্র গিয়ে পৌছতে পেরেছিলাম। আয়াস একখানা ছোট গ্রাম। তুর্কীর গ্রাম এবং শহর প্রায় একই ধরনের। তুর্কীর কেন, ইউরোপের প্রায় সর্বত্রই এরূপ দেখেছি। আমাদের মত এলোমেলো ভাবে কেউ ইউরোপে বাস করে না।

পথ ছেড়ে গ্রামে এলাম। গ্রামের বাইরে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলাম। যখনই কোন ছোট শহর অথবা গ্রামে এসে উপস্থিত হয়েছি অমনি উৎসুক ছেলেরা এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তারপর পুলিশ এসে হোটেলে নিয়ে গিয়েছে। যখনই বের হয়েছি, ছেলেরা আবার ঘিরে দাঁড়িয়েছে, অথবা পেছন পেছন ছুটতে আরম্ভ করেছে অনেকে আবার সাইকেল নিয়ে সংগে চলত, পৃথিবী পর্যটকেব সংখ্যা খুব কম, বিশেষ করে ভারতবর্ষ হতে। তুর্কীতে কজন ভারতবাসী সাইকেলে ভ্রমণ করেছেন? বোধ হয় আমিই প্রথম। সে জন্যই সম্ভবত আমার সম্বন্ধে তুর্কীর ছেলেমেয়েদের কৌতূহল ও আগ্রহ এত বেশী ছিল।

একটু বিশ্রামান্তে উঠে দাঁড়ালাম। সুন্দর, পরিষ্কার গ্রাম। জেন্দআর্ম গ্রামের মসজিদের পাশেই একটা উঁচু ঘরে থাকে। আমার গ্রামে প্রবেশের সংগে সংগেই একজন জেন্দআর্ম নেমে এল। গ্রামে কে প্রবেশ করল, কে বেরুল, জেন্দআর্ম তা যাতে দেখতে পায় সেইজন্যই তাদের ঘর উঁচু করে গড়া হয়েছে। জেন্দআর্ম পাসপোর্ট পরীক্ষা করে তার একটা নকল লেখবার খুব চেষ্টা করে আমাকে নিকটবর্তী একটি হোটেলে নিয়ে গেল। হোটেল জেন্দআর্মদের বাড়ির কাছেই ছিল।

তুর্কীর গ্রামের গড়ন অবিকল ইউরোপীয় গ্রামের মতই। গ্রামের ঠিক মধ্যস্থলে মসজিদ, মসজিদকে কেন্দ্র করে চারদিকে চারটা পথ বেরিয়েছে। পথের দুদিকে লোকের বাড়ি। ইউরোপেও গ্রামের ঠিক মধ্যস্থলে একটা চার্চ। তাকেই কেন্দ্র করে চারটা পথ চারদিকে বেরিয়েছে। এরূপ চার্চকে বলে ডোম্।

হোটেলে আমাকে যেখানে থাকতে দেওয়া হল, তাতে আমার মন উঠল না। তাই ইংগিতে জানালাম, এরূপ বিছানায় শোব না। জেন্দআর্মের মাথা নত হয়ে এল। সে ভেবেছিল, আমি আরব। রুম বদল করা হল। সুন্দর বিছানা। ধবধবে পরিষ্কার চাদর বিছান। রুমে জল গামছা এবং সাবান রয়েছে। রুম

দেখে আমার তৃপ্তি হল। জেন্দআর্মকে বসিয়ে রেখেই হাতমুখ ধুয়ে জুতাজোড়া মুছে নিয়ে তারই সংগে খেতে বের হলাম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একখানা গ্রাম্য হোটেলে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। পথে গ্রামের ছেলেমেয়েরা আমার অনুসরণ করল। হোটেলে গিয়ে সামান্য খাবারের আদেশ করলাম ইংগিতে। যে লোকটি আমাকে খাবার দিল তার মাথায় চুল ছিল না। তার মাথায় টাক পড়েনি অথবা কোন ভীষণ রোগের জন্যও চুল যায় নি। চুলের এ অবস্থা হামহামে স্নান করার জন্য হয়েছে। তুর্কীতে হামহামে স্নানের দরুন কত লোকের মাথার চুল উঠে গেছে তার হিসাব যদি করা যায়, তবে দেখতে পাওয়া যাবে শতকরা দশ জনেরই এই দশা।

বয়ের মাথার দিকে চাইলে আর খেতে ইচ্ছা হয় না। ইংগিতে বললাম, একটা রুমাল মাথায় বেঁধে ফেল, তারপর আমার কাছে দাঁড়াও। জেন্দআর্ম তৎক্ষণাৎ তাঁর খাকি রুমাল খানা বয়কে দিয়ে দিলেন। সেও তৎক্ষণাৎ তাই মাথায় জড়িয়ে নিলে। জেন্দআর্ম বার বার আরব সভ্যতাকে গালি দিয়ে বয়ের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন। তারপর ইংগিতে আমাকে জিগ্গাসা করলেন, এসব রোগের আমি কোন ঔষধ জানি কি না। ঔষধ আমি কিছুই জানি না, তবে লোকটির মাথার অবস্থা দেখে মনে হল, এতে কোনরূপ বীজাণু প্রবেশ করেছে, এবং বীজাণু ধ্বংসের একটা ঔষধ পটেসিয়াম পারমাংগানেট। পকেট হতে তাই একটু বের করে দিয়ে বলে দিলাম, গরম জলে এ ঔষধটি মিশিয়ে রোজ দুবার করে মাথা ধুতে। আমার খাওয়া হয়ে গেলে বয় তখনই গরম জল করে মাথা ধুয়ে ফেলল এবং একটু আরাম পেয়েছে এরূপ ভাব প্রকাশ করল।

পূর্বে প্রত্যেক গ্রামে হামহাম * ছিল। এখন আর তা নাই। হামহাম ভেংগে দেওয়া হয়েছে। গ্রামের মধ্যে হামহাম শ্রেণীর আরও অনেক অনিষ্টকর প্রথা ছিল, কিন্তু তার একটারও আর অস্তিত্ব নাই।

ভারতবর্ষ এবং জাপানেই শুধু হোটেলে বারবনিতার প্রবেশ নিষেধ ছিল। ভারতের অনেক হোটেলে এখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত গুপ্ত বারবনিতার

* একটা প্রকাণ্ড চৌবাচ্চাতে গরম জল থাকত। বহুদিন সে জল পরিবর্তন করা হত না। এই চৌবাচ্চার দূষিত জলে গ্রামের সবাই স্নান করত। এই চৌবাচ্চারই নাম ছিল হামহাম।

প্রচলন হতে আরম্ভ হয়েছে। তুর্কীতেও ঠিক সেরূপই ছিল, কিন্তু আতা তুরুকের বিচক্ষণ এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসনপদ্ধতিতে তুর্কীতে আর বারবনিতা নাই। ফকিরের সংগে সংগে বারবনিতাও চলে গেছে। ফকির এখন কাঁধে কোদাল নিয়েছে, বারবনিতাদের অনেকেই বিয়ে করেছে। সময়ের পরিবর্তনে তুর্কীর পরিবর্তন হয়েছে, আরও কত হবে তার ইয়ত্তা নাই। তুর্কী এরই মধ্যে অনেকটা স্বাস্থ্য সন্‌চয় করেছে, অবশ্য পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করতে সময় লাগবে।

আয়াস স্বাস্থ্যকর স্থান। গরমের সময়ও উভয়ের শীতল বাতাস এই গ্রামের উপর বয়ে যায়। তাই নানা স্থান হতে লোক এসে আয়াসে বাস করে। পূর্বে অনেকে বায়ু পরিবর্তনের অছিলায় এখানে এসে নানা লজ্জাকর ও ঘৃণ্য ব্যাপারে লিপ্ত হত, কিন্তু এখন তার অবসান হয়েছে। এখন হোটেলের কোন্ রুমে কখন কিরূপ লোক আসে, তার সংবাদ জেন্দআর্মকে দিতে হয়। জেন্দআর্ম নবাগতের স্বাস্থ্য কেমন আছে দেখেন, তাকে বুঝিয়ে দেন তুর্কীর পুরাতন আয়াস আর নেই, বোরখার সংগে সংগে বারবনিতাও চলে গেছে। সেজন্যই বড় বড় সজ্জিত হোটেলগুলি খালি। এরূপ অবস্থায় আমাদের দেশের হোটেলের মালিক হয়তো মাথায় হাত দিয়ে বসত। কিন্তু তুর্কীতে মাথায় হাত দিয়ে বসবার দরকার নাই। তুর্কীর এরূপ চিন্তাভাবনার অবসান হয়েছে। হোটেল সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়।

পান্‌জাবের দিকে দেখেছি ব্রাহ্মনগণ গ্রামে গ্রামে বলে বেড়ায় আজ অমাবস্যা, কাল দশরা, পরশু অমুক পূজা। তারা লোককে একটা খরচের তালিকা মনে করিয়ে দেয় অথচ আয়ের কোন উপায় বলে দিতে সক্ষম হয় না। তুর্কীতে আয়ের তালিকা ফর্দ করে গলা ফাটিয়ে যেখানে সেখানে বলতে কোন আপত্তি নেই, যদি সেই আয় করার জন্য অন্যকে বন্‌চিত না করতে হয়। কিন্তু ধর্মকর্ম সংক্রান্ত খরচের তালিকা নিয়ে বের হলেই জেন্দআর্ম ধরবে। এ অপরাধের শাস্তি প্রত্যক্ষ করি নি বটে, তবে শুনেছি কমের পক্ষে ছয়টি মাস সশ্রম কারাদণ্ড।

বিকালে জেন্দআর্মকে সংগে নিয়ে বেড়াতে বের হই। একটা ঝরণার কাছে গিয়ে দেখি, অনেকগুলি লোক সাবান মেখে ঠাণ্ডা জলে স্নান করছে। গ্রামে এখন আর হামহাম নাই, সেজন্য অনেকেই ঝরণার জলে স্নান করতে বাধ্য হয়।

অনেকে আবার বাড়িতে গরম জল করে কাকস্নানও করে। আমি তুর্কীতে হোটেলে থাকার সময় কাকস্নানই করতাম। কারণ ঝরণার শীতল জলে স্নান করলে শরীর অসুস্থ হতে পারে বলে ভয় হত।

হোটেলে ফিরে আসার পর একজন বৃদ্ধ তুরুক এসে বসলেন এবং নানা ভাষায় আমাকে মনের ভাব বুঝাতে চেষ্টা করলেন। ইরানী, আরব, তুরুক, গ্রীক এসব ভাষা একত্র করে খিচুরী ভাষায় তিনি কথা বলছিলেন। বর্তমানেও মধ্য এশিয়ায় ইরানী ভাষার বেশ প্রচলন আছে। আমাদের দেশেও অনেক আরবী শব্দ ইরানী ভাষারূপেই প্রবেশ করছে। ভেবে দেখলাম, ইরানী ভাষার প্রায় কথাই বুঝতে সক্ষম হয়েছি।

বৃদ্ধের বক্তব্য বিষয় ছিল, জাতীয়তাবাদ অনেক সময় সমাজে শান্তি আনতে পারে না। শুধু ধর্ম তা আনতে পারে। আমি ভাল করে ইরানী জানতাম না তাই বৃদ্ধকে বুঝাতে পারি নি ধর্ম জাতীয় ভাব লোপ করতে অক্ষম হয়েছে, তাই হ'ত যদি তবে আরব জাত তুরুকদের পদানত হত না। এখনও তুরুকগণ আরবদের নিম্ন শ্রেণীর লোক বলেই ভাবে। আরব ভেবে অনেকে আমার প্রতি হীন ব্যবহার করেছে তা বাস্তবিকই অসহনীয়। ধর্ম বল, সমাজ বল, রাষ্ট্র বল—একটা বৈষম্য সকল সময়েই থাকবে, যতক্ষণ না দেশে অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রচণ্ডভাবে অনুভূত হয়। রাশিয়াতে অর্থনীতির পরিবর্তন হয়েছে, তাই আপনা হতে সকল রকমের বিভেদ লোপ পেয়েছে। অতি কষ্ট করে বৃদ্ধকে শেষের কথাটা বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম। বৃদ্ধ এক লাফে আমার কাছ থেকে সরে গিয়ে বললেন, "কমিউনিস্তা"। আমি বললাম, আমি কমিউনিষ্ট নই, রাশিয়ায় যাই নি, যাবও না, তবে পর্য্যটন করে এই অভিগ্‌গতা অর্জন করেছি। বৃদ্ধ আমার কথা বুঝতে পেরেছিলেন কি না জানি না, কথার সমাপ্তি কিন্তু এখানেই হয়েছিল।

আয়াসের পরিচয় নিয়ে পরদিন প্রাতে বেপারজার দিকে রওনা হলাম। বেপারজা আয়াস হতে চল্লিশ মাইল দূরে। লোকমুখে এবং টুরিস্ট বিভাগ হতে শুনেছিলাম এদিকের পথটা বেশ ভাল করে তৈরী হবে। আমি যে পথে চলেছি সেই পথ সুলতানের সময়ের। সুলতানের তৈরী পথটা দেখে মনে হল, এতে ইন্‌জিনিয়ারিংএর বিশেষত্ব নাই। যে সকল সেতু তৈরী হয়েছে তার উপর দিয়ে বড় বড় কামান নিয়ে যাওয়া যায় না, বড় বড় লরীও চলে না। বর্তমান যুগের

উপযুক্ত পথঘাট নয়। আনুমানিক পনর মাইল যাবার পর একটি লোককে পথের পাশে বসে থাকতে দেখে সাইকেল হতে নেমে তার কাছে গিয়ে বসলাম। লোকটি অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে হিন্দুস্থানীতে জিগ্গাসা করল আমি হিন্দু কি না।

আমি তাকে বললাম, হিন্দুস্থানী কোথায় শিখেছেন?

রেংগুন জেলে শিখেছি। তথায় আমরা যুদ্ধের কয়েদী ছিলাম।

ভারতবর্ষের লোকদের দেখে আপনার কি মনে হল?

বেশ সুখী লোক। তারা আমাদের বেশ আদর-যত্ন করেছে, এমন কি জেলের কয়েদীরা পর্যন্ত। বাস্তবিক হিন্দুস্থান সুন্দর দেশ।

কথায় কথায় জিগ্গাসা করলাম এখানে খাবারের কোথাও বন্দোবস্ত হবে কি না। লোকটি বললে, তার বাড়ি এখান হতে চার মাইল দূর। যদি তার সংগে তার বাড়িতে যেতে রাজী হই তবে বেশ ভাল করেই পেট বোঝাই করে খাইয়ে দেবে। আমি তাতে রাজী না হওয়ায় সে আমাকে নিকটস্থ গ্রামে নিয়ে গিয়ে সেখানে খাবার বন্দোবস্ত করল। খাবার খেয়ে আমরা পথের পাশে বসেই তুর্কী সম্বন্ধে নানা কথা বলতে লাগলাম।

তুর্কীর বর্তমান পরিবর্তনে কি লোকের আপত্তি আছে?

নিশ্চয়ই আছে। আমাদের দেশের লোক তোমাদের দেশের লোকের মত ধর্মপরায়ণ। পুরাতনকে বদলে যদি নতুনকে গ্রহণ করা যায় তবে কি ভগবান সুখী হবেন?

বর্তমানে তুর্কীর আর্থিক অবস্থা কেমন?

বেশ ভাল। পূর্বের চেয়ে হাজার গুণে ভাল। কিন্তু টাকাতে কি হবে? ঐ দেখ, আমার মেয়েটা আমার কথা না শুনেই সেদিন একটা ছোকরার সংগে বিয়ের সাব্যস্ত করেছে। এসব কি পাপ নয়? তবে দুঃখের কথা, এসব অন্য লোকের কাছে বলা চলে না। ভারতের লোক ধার্মিক, ধর্মে তাদের মতিগতি চিরদিন থাকবে বলেই তোমার কাছে বলছি। খবরদার, এসব কথা কারও কাছে বলো না। আজ কোন্ দিকে যাবে ঠিক করেছ?

আজ বেপারজা যাব ঠিক করেছি।

আরে এ যে ভয়ানক চড়াই, তাড়াতাড়ি চলে যান।

লোকটি উঠে দাঁড়াল। ইউরোপীয় ধরনে তাকে বিদায়-বাণী বললাম।

সে চলে যাওয়ার পর ভাবলাম এখনও লোকটার মানসিক কোন পরিবর্তন হয় নি। লোকটার কথা ভেবে অনেকক্ষণ পথ চললাম। বিকালের রৌদ্র পথের উপর পড়েছিল, সেই রৌদ্রে ধীরে ধীরে সাইকেল চালিয়ে অগ্রসর হতে বেশ ভাল লাগছিল। অনেকক্ষণ চলার পর যখন সূর্য অস্ত গেল, আমার মনে হল পথ হারিয়েছি। পথ হারিয়েছি বলে কোন দুঃখ হল না। তবে এরা পথে কিলোমিটারের পোস্ট রাখেনি বলে রাগ হয়েছিল। ম্যাপে পরিষ্কার করে লেখা রয়েছে, তিরিশ হতে পঁয়ত্রিশ মাইল মাত্র পথ। এর বেশী হতেই পারে না, অথচ সারাদিন চলেও চল্লিশ মাইল শেষ হল না, সে কিরূপ কথা? পথের পাশে বসে ভাবলাম, কত ঘণ্টা শুধু ব্রেক চেপে সাইকেল চালিয়েছি, অর্থাৎ সাইকেল পেডেল করতে হয় নি। এরূপ চালিয়েছি প্রায় চার ঘণ্টা। ঘণ্টায় যদি আট মাইল করে চলে থাকি, তবুও এসময়ে অন্তত বত্রিশ মাইল চলেছি। আর চার ঘণ্টায় কি বার মাইল চলি নি? ম্যাপে নিশ্চয়ই কোথাও ভুল আছে। কতকগুলি লোক মাল-বোঝাই ঘোড়ার গাড়িতে করে যাচ্ছিল, তাদের বেপারজার কথা জিগ্‌গাসা করলাম। কি যে তারা বল্‌ল তার কিছুই বুঝলাম না। একটু এগিয়ে গিয়ে আর একজন লোকের সংগে সাক্ষাৎ হল। তার বাড়িখানি নতুন তৈরী দেখে ভাবলাম তার বাড়িতে থাকা সম্ভব হতে পারে। হঠাৎ মনে হল, রুটি একটা চেয়ে নিই, তারপর ভাবব তার বাড়িতে থাকব কি না। রুটি চাইতেই লোকটি আমাকে একখানা বড় রুটি এনে দিল। ভাবলাম আজ মনকে একটু শিক্ষা দিতে হবে। কারও বাড়ি দেখলেই সেখানে গিয়ে হাজির হতে ইচ্ছা হয়, তা কি ভাল কথা? আজ বরং বাইরে থাকব। এই ভেবে কতক্ষণ চলেছি, হঠাৎ দেখি শহরের আলো দেখা যাচ্ছে। আশার আলো জ্বলে উঠল, সংকল্পিত সংযমের বাঁধ ভেংগে পেল। শহরে পৌঁছে জেন্দআর্মের সাহায্যে একটা হোটেলে গিয়ে একখানা রুম দখল করে শুয়ে পড়তে না পড়তেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

প্রভাতে উঠে আর কোথাও যেতে ইচ্ছা হল না। ভাবলাম আজ এখানেই বিশ্রাম করা যাক। শহর যদিও ছোট, তথাপি এখানে লোকের মধ্যে নবজীবনের সাড়া পাওয়া যায়। পথঘাট পরিষ্কার। স্কুলের ছেলেমেয়েরা কাজের সংগে তাল ফেলে চলবার সম্পূর্ণ উপযোগী। ঘরগুলি পরিষ্কার; এমন কি ঘরের নম্বরটি পর্যন্ত ঝক ঝক করছে। শহরে দই এবং দুধের অভাব নাই। নতুন করে

গোত্বঙ্গের বিলিব্যবস্থা হয়েছে। ভাবলাম, এরূপ স্থানে একদিন বিশ্রাম করা দরকার।

এই শহরে আবার নতুন ধরনের একটা ব্যাংকও খোলা হয়েছে। ব্যাংকের ম্যানেজার মহাশয় বড়ই বিবেচক। কিছু যদি মনে না করেন—বলেই তিনি নিজে এসে, আমার হাতে পাঁচটি তুর্কীর পাউণ্ড তুলে দিলেন। আমার আনন্দের আর সীমা রইল না। কএকজন রমণী আমাকে হাত দেখাতে এলেন। আমি প্রমাদ গণলাম। আমি হাত দেখতে জানি না জেনে তাদের মন ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, কিন্তু আমি মোটেই দুঃখিত হই নি। তাঁদের মুখ ঢাকা নয়, তাঁরা স্বাধীন। তাঁদের মধ্যে দু একজন ফরাসী ভাষাও বলতে পারতেন আমি একটি ফরাসী কথাও জানতাম না। কি করে তাঁদের সংগে কথা বলব? কিন্তু আমার সংগে কথা না বলতে পেরে এবং আমার দ্বারা তাঁদের হাত দেখা হয় নাই বলে তাঁরা একটুও দুঃখিত হলেন না। যাবার বেলা হোটেলের বয়কে কি বলে গেলেন তাও বুঝলাম না।

বিকালে আঁকাবাঁকা পথ ধরে হোটেল-বয়ের সংগে চলতে চলতে মহিলাদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়ে দেখি, তাঁরা আমারই জন্য অপেক্ষা করছেন। আমার যাবার পর তাঁরা আমাকে বলতে দিয়ে কাফি এনে হাজির করলেন এবং ইংগিতে হিন্দু রমণীর কথা জিগ্গাসা করলেন। আমি বুঝাতে চেষ্টা করলাম, হিন্দু রমণীর অবস্থা ভাল নয়, খারাপ।

অনেকে হয়তো বলবেন, বিদেশে গিয়ে দেশের বদনাম করা অন্যায় হয়েছে। যাঁরা এরূপ মত পোষণ করেন তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিই—আমি অনাবশ্যক মিথ্যা বলতে রাজি নই। মিথ্যাবাদীরা নিজের আত্মীয়-স্বজনকেই প্রথম ঠকাতে আরম্ভ করে, তারপর অপরকে। তুর্কীর নারীরাও বৃহত্তর নারী সমাজের অংশ, তাই ওরা আমাদের দেশের নারীর কথা ঠিক ঠিক ভাবে জানবে বৈকি। তাদের কাছে তাদের বোনদের সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলে কি লাভ? দ্বিতীয় কথা হল, নারী জাতির সম্বন্ধে আমার যে ধারণা, অন্যের হয়তো সেরূপ নয়, এবং সে ক্ষেত্রে মতের বিভিন্নতা হওয়া স্বাভাবিক। আমাদের দেশে অনেক নারী আছেন যাঁরা তাঁদের বর্তমান অবস্থাকেই উত্তম বলে মনে করেন, কিন্তু তাঁদের ধারণা যথার্থ কি না তা বিবেচ্য বিষয়।

তুর্কীর নারীদের সংগে বিশেষ কথা হল না। ফিরে আসতে বাধ্য হলাম

কারণ জেন্দআর্ম আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। জেন্দআর্মের অফিসে গিয়ে দেখি, একজন ইংলিশ জানা লোক আমার অপেক্ষায় বসে আছেন। তিনি কতকগুলি প্রশ্ন জিগ্‌গাসা করলেন আর আমি সেগুলির জবাব দিয়ে যেতে লাগলাম। এখানে কতকগুলি প্রশ্নের জবাব দেবার সময় একটু মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছিল, কারণ তা না-হলে হয়তো আদানায় পৌছার পর যে অবস্থা হয়েছিল সেই অবস্থারই পুনরাবৃত্তি হত।

আপনি কি কখনও সৈনিক বিভাগে কাজ করেছেন?

না। ( যদিও করেছি )

গত মহাযুদ্ধের সময় কি করতেন?

তখন আমি কলেজে পড়তাম ( কলেজের আংগিনায় প্রবেশ করবার সৌভাগ্য হয়নি এমন কি ম্যাট্রিকুলেশনের কোঠাই পার হই নি। )

এরূপ দেশ-ভ্রমণে কারও কাছ থেকে কোন সাহায্য কিংবা উৎসাহ পান কি?

না।

তুর্কী ভ্রমণে কেন এসেছেন?

তুর্কী ইউরোপের পথে পড়ে বলেই আসতে বাধ্য হয়েছি। এতে কি কিছু অন্যায় হয়েছে, না তুর্কীর এতে কোন ক্ষতি হয়েছে?

না, সেরূপ কিছু নয়। তবে এদেশে বোধ হয় আপনিই দ্বিচক্রযানে প্রথম পর্যটক।

বেশ, ভাল কথা। একটা রেকর্ড হয়ে রইল।

তুর্কী সম্বন্ধে আপনি কি অভিগ্‌গতা অর্জন করেছেন?

তুর্কী ঘন-তমসা হতে সবেমাত্র বের হয়ে তরুণ অরুণের সামনে দাঁড়িয়ে নতুন দর্পনে নিজের নতুন মুখ দেখছে।

সে নতুন মুখ সুন্দর না বিতিকিচ্ছি?

সে নতুন মুখ সুন্দর এবং স্বাস্থ্যে পরিপূর্ণ।

মুস্তাফা কামাল সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?

তিনি নিশ্চয়ই আতা তুরুক।

মহিলাদের সংগে কি কথা হয়েছিল?

তাঁরা ভারতীয় নারীদের কথা জিগ্‌গাসা করেছিলেন।

আপনি কি বলেছেন?

আমি বলতে চেয়েছিলাম, যেখানে পুরুষরা স্বাধীন নয়, সেখানে নারীর অবস্থা ভাল হতে পারে না।

তুর্কীর নারীদের সম্বন্ধে আপনার কি মত ?

এই তো মাত্র বোরখা খুলেছে, ক্রমে চোখ ফুটবে, তারপর শিক্ষা হবে এবং পরে নিজেদের কথা নিজেরাই ভাববেন।

এরূপ করে কথা বলা যে কত কষ্টকর, যারা প্রশ্নের জবাব দেয় তারাই ভাল করে বুঝে। এই কটা কথার জবাব দিতেই আমার ক্লান্তি বোধ হয়েছিল। এদের কাছ থেকে মুক্ত হয়ে পথে এক গ্লাস জল খেয়ে হোটেলে এসে সারাটি বিকাল শুয়ে কাটিয়ে দিলাম। পরদিন প্রাতে একটি রেস্তোরাঁয় প্রভাতী খানা খেয়ে নালীহান-এর দিকে রওনা হলাম।

পথ পূর্বের দিনের মতই ছিল। কষ্টে পথ চলে বিকালে গিয়ে নালীহান পৌছলাম। তথায় একটি দোতালা হোটেলের উপরতলার একটি রুম ভাড়া করে, জিনিষপত্র গুছিয়ে রেখে একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে কিছু খাব বলে বসলাম। সেখানে একজন লোকের সংগে সাক্ষাৎ হল। ইংলিশ তিনি যা জানেন, তাতেই তিনি তুষ্ট। তিনি আমার সংগে অনর্গল ইংলিশ বলে যেতে লাগলেন। ভদ্রলোকের বাহাদুরী যাতে খর্ব না হয়, সেজন্য তাঁর সকল কথাই যেন বুঝেছি সেরূপ ভান করে খাবার খেয়ে হোটেলে বসে একটু বিশ্রাম করলাম। বিকালে তাঁকেই সংগে নিয়ে একটা নদীতে স্নান করতে গেলাম। নদীতে মাত্র এক হাঁটু জল। স্নান করা হয়ে গেলে কাছেরই একটা উইণ্ড মিল-এর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। মিলের মালিক একজন স্কচম্যান। তিনি আমাকে পেয়ে বড়ই সুখী হলেন এবং নিজের হাতে কাফি তৈরী করে খেতে দিলেন। ধীরে এবং সংগোপনে বলে দিলেন এখানকার লোকের কিছুই পরিবর্তন হয় নি, অতএব সাবধান। কথাটার নানা অর্থ, বুঝতে বাকি রইল না।

ফের হোটেলে এসে কাপড় ছেড়ে রেস্তোরাঁতে গিয়ে বসলাম। তুরুক ভদ্রলোক আমাকে উপহাস করে বার বার বলতে লাগলেন—কালো লোক। তারপর নিজের হাতের সার্ট অপসরণ করে তাঁর শ্বেত চর্ম দেখাতে লাগলেন। আমি তাঁর ঐ শ্বেত চর্ম দেখবার জন্য যদিও উৎসুক ছিলাম না, তবুও বার বার শরীরের রং দেখানর জন্য একবার বললাম সাদা রং বড়ই কুৎসিত। তিনি বললেন, আংগুরগুলি বড়ই টক এই বলতে চান কি ?

এক অপূর্ব জীবকে দেখে হঠাৎ আমাদের কথা বন্ধ করতে হল। একটি লোক ফেজ মাথায় দিয়ে রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করল এবং একটি চেয়ার দখল করে বসল। দেখতে দেখতে কএকজন লোক তার কাছে গিয়ে বসল। জিগ্গাসা করে জানলাম, ফেজ পরিহিত লোকটি ইজিপ্ট হতে এসেছে এবং জাতে সে আরব। ফরাসী এবং ইতালী ভাষা সে বেশ বলতে পারে। তুর্কীর পরিবর্তন দেখবার জন্যই সে এদেশে এসেছে। আমরা তারই কথা শুনছিলাম অনেকক্ষণ ধরে। হঠাৎ একজন জেন্দআর্ম রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করেই তাকে রেস্তোরাঁ হতে বের করে নিয়ে চলল তাদের অফিসের দিকে। ফেজটা মিশরীয় লোকটির মাথা হতে খুলে নিয়ে জেন্দআর্ম নিজের হাতে রাখল। জেন্দআর্মের মুখের অবস্থা দেখে মনে হয়েছিল সে ভয়ানক রেগে গেছে। মনে মনে ভাবলাম এই করেই পরিবর্তন আসে। গতকল্য যে জিনিসটি মাথার মুকুট ছিল, আজ তা ঘৃণ্য পদার্থ। মানুষের মধ্যে যখন চেতনা আসে, গ্যান আসে, তখন সে নিজের প্রিয়বস্তুকেও পরিত্যাগ করতে কোনরূপ সংকোচ করে না।

হোটেলের একটু দূরে নদীতে স্নান করে এসেছি। ইচ্ছা হল এই পার্বত্য নদীতীরে একটু বেড়িয়ে আসি। নদীর উত্তর তীরে উচ্চ পর্বত, দক্ষিণ তীরটা পাথরময় সমতলভূমি। নদীতীরে অনেকক্ষণ বসে নানা চিন্তায় যখন মগ্ন ছিলাম, তখন পূর্বপরিচিত ভদ্রলোক আমার কাছে এসে বসে নানারূপ কথা বলতে লাগলেন। .তিনি কোন্ স্থান হতে ইংলিশ শিখেছেন জিগ্গাসা করে জানলাম, তিনি পূর্বে স্তাম্বুলে কোনও এক আমেরিকান মিশনারীর সংগে ছিলেন এবং মিশনারীর কাছ থেকেই তিনি এই ভাষা আয়ত্ত করেছেন। তিনি কথা প্রসংগে বললেন, এখানকার লোক যদিও রাত্রে স্কুলে যায় তবুও অনেকের স্বভাবের পরিবর্তন মোটেই হয় নি। হবে বলেও মনে হয় না"। যাদের স্বভাবের পরিবর্তন হয় না এবং সমাজ যাদের দ্বারা ক্রমাগত কলুষিতই হয়, তাদের হয়তো জেলেই পাঠান উচিত।

হোটেলে ফিরে আসার পর দেখলাম, হোটেল-বয় অন্য একটি লোকের সংগে লড়ছে। তাদের কুস্তির অবসানে যখন উভয়ই বিশ্রাম করতে বসল, তখন দেখলাম হোটেল-বয়ের কনুইএর চামড়া উঠে গেছে এবং রক্ত পড়ছে। ক্ষতস্থান হতে রক্ত পড়া দেখলেই আমাদের কি একটা ভাব বলতে পারি না,

আপনা হতেই সাহায্য করার প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। বয়কে ইংগিতে ডেকে রুমে নিয়ে গিয়ে ক্ষতস্থান ধুয়ে দিলাম এবং আমার সংগে যে ঔষধ ছিল তাই লাগিয়ে দিলাম। বয় আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিল।

আফগানীস্থানের কয়েকজন হিন্দু আমাকে কয়েকটি পুরাতন রৌপ্য এবং তাম্রমুদ্রা দিয়েছিলেন লণ্ডন এবং প্যারীতে যাচাই করে দেখতে। এরূপ পুরাতন মুদ্রা সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। বসরাতে যাবার পর এক শিখ ডাক্তারও আমাকে কতকগুলি পুরাতন আরবী মুদ্রা দিয়েছিলেন একই উদ্দেশ্যে। তাদের প্রত্যেককে আমি বলেছিলাম, সাইকেলে ভ্রমণকারীর নানারূপ বিপদ-আপদ আছে, অতএব তাদের মুদ্রাগুলি যথাস্থানে পৌঁছবে কি না তার নিশ্চয়তা নাই। এভাবে নিঃসংকোচে এক অপরিচিত লোকের কাছে মূল্যবান মুদ্রা দেবার একমাত্র কারণ হল, আমার সংগে কথা বলে অনেকেই বুঝতে পেরেছিলেন, আমি পুরাতনের ভক্ত নই। এমন কি পুরাতন মুদ্রা বিক্রি করেও দুপয়সা অর্জন করতে নারাজ। সদাসর্বদা আমি মনে করতাম যে, ব্যবসা এবং দেশ দেখা এক সংগে চলে না। দেশ দেখতে হলে মনকে অন্য কোন কাজকর্মে নিযুক্ত করা মোটেই উচিত নয়। যে যা চায় না, লোক তারই উপর সে ভার দিতে ভালবাসে। এঁদের দেওয়া রৌপ্য এবং তাম্র মুদ্রা যত্নের সহিত রাখতেও আমার ইচ্ছা হত না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ আমি কখনই রাখতাম না।

রাত্রে খেতে যাবার সময় দরজা বন্ধ করেই গেলাম। রেস্তোরাঁর স্টেজে সেদিন থিয়েটার হচ্ছিল। প্রথম দৃশ্যে ছিল, একটি মেয়ে বোরখা পরে পথে বের হয়েছে এবং তার সংগে অন্য একটি রমণীর সাক্ষাৎ হয়েছে। দুজনে মিলে যখন অন্য একটা ঘরে গিয়ে উভয়ের বোরখা খুলে ফেলল, তখন দেখা গেল স্ত্রীলোক একজন, অপরটি পুরুষ। দ্বিতীয় অংকে দেখানো হল, একজন বোরখা-পরা রমণী পথে চলেছে, পথে একজন পুরুষের সংগে তার সাক্ষাৎ হল। একে অন্যকে ইংগিত করলে উভয়ে মিলে যখন একটা ঘরে গেল, তখন দেখা গেল মেয়েলোকটি যুবতী নয়, প্রৌঢ়া এবং পুরুষটি তার আত্মীয়। এর পর উভয়ে মাথা নত করে বিপরীত দিকে প্রস্থান করল। বোরখার অপপ্রয়োগ ও অসুবিধা সম্পর্কিত এ ভাবের সামাজিক অপেরা দেখে হোটেলে এসে দেখি রুমের জানালা খোলা। এ সম্বন্ধে তখন মাথা না ঘামিয়েই শুয়ে পড়লাম।

ঘুম থেকে উঠে শহর থেকে বের হয়ে পড়লাম। আজ আমাকে অনেক দূরে যেতে হবে। পথিমধ্যে খোলা জানালার রহস্য উদ্ঘাটিত হল—মুদ্রার থলিটা উধাও হয়ে গেছে। যাক চলে, এরূপ যখের ধন আমার কাছে না থাকাই ভাল। আমার আর একটা নিয়মও ছিল। বিশেষ কোন দরকার না হলে পেছনে ফিরে যাই না। টাকা কড়ি বিশেষ দরকার নয় পর্যটকের পক্ষে। তাই আর ফিরলাম না, এগিয়ে চললাম।

গত রাত্রের অপেরার কথা মনে হতে লাগল। সমাজের ব্যাধি উপদেশে যায় না, যেতে পারে না। চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। সমাজ জাহান্নমে যাক—সামান্য লাভের জন্য এই মত অনেকেই পোষণ করে। তা যদি না হত, তবে মানব-সমাজ এত নীচস্তরে নেমে যেত না। আতা তুরুক তাই আইন করে বোরখা-পরা উঠিয়ে দিয়ে এখন অপেরার সাহায্যে দেখাচ্ছেন, সমাজে কত পাপ লুক্কায়িত ছিল। এখন অপেরা দেখে অনেকের মাথাই নীচু হয়ে আসে। পূর্বে যা হিতকর বলে সমাজে প্রচলিত ছিল, এখন তার দোষ প্রকাশ পেয়েছে। সমাজ এখন ভাবতেও ভয় পায়, সমাজে এত বড় একটা গর্হিত প্রথা লুকিয়ে ছিল। এরূপ ভাবতে ভাবতে যখন সাইকেলে চলছিলাম তখন হো হো করে হাসছিলাম। যদি কেউ আমার সে হাসি শুনত, তবে আমাকে নিশ্চয়ই পাগল ভাবত। পর্যটক-জীবনে এরূপ করে কতদিন হেসেছি, আবার কতদিন চীনের যুবক-যুবতীর কবরে বসে কেঁদেছি তার ঠিক নাই। মানব-সমাজের সুখ-দুঃখকে নিজের করে ভাবতে পারে একমাত্র ক্ষুদ্র স্থানবিশেষে ব্যক্তিবিশেষে আসক্তিহীন যাযাবর পর্যটকই।

নালীহান হতে গুণ্যক পর্যন্ত পথটা পাহাড়ের গায়ে গায়ে চলেছে। কখনও উঁচু কখনও নিচু, তবে মোটামুটি উপরের দিকেই চলেছি বলে মনে হল। পথের দুদিকে ঘন পাইন গাছ। আমার কাছে পাইন বৃক্ষের সৌন্দর্য ভাল লাগে। কতক অগ্রসর হয়েই বিশ্রাম করি, আবার চলি, আবার বিশ্রাম করি। যখনই কোন লোকালয় পেয়েছি, কোনরূপ দ্বিধা না করে খাবার চেয়ে খেয়ে এসেছি। এরূপ করে সারাদিন পথ চলে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তখন মনে হলো শরীরকে আর অধিক কষ্ট দিলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে। নিকটেই সুন্দর পাইন গাছের নিচে শয্যা রচনা করতে লেগে গেলাম। শয্যা রচনা করা হল। খাওয়া হল। তারপর হাতের উপর মাথা রেখে পাইন গাছের ছত্রবিশিষ্ট

শাখা-পল্লবের ছিদ্র দিয়ে আকাশের পানে চেয়ে রইলাম। কবিরা এরূপ অবস্থায় কবিতা লিখেন, কিন্তু আমি কবি নই, তাই এরূপ অবস্থার বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

রাত্রিকালেও বনে জংগলে শুতে ভয় করি নি। এখানকার গভীর বনে হিংস্র জীব আছে কি না সন্দেহ। দ্বিতীয় কথা হল, ছোট বেলায় যে সকল কাল্পনিক ভয়ের দ্বারা আমার মনকে বোঝাই করে রাখা হয়েছিল, বর্তমানে সে সকল ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি। ভূতের ভয় আমার নাই, কারণ ভূত আছে বলে যে একটা ধারণা করিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা চলে গেছে। মনে হল হয়তো আতা তুরুকের ভয়ে বনের জন্তুও পালিয়েছে। যেমন করে আপন গৃহে শুয়ে থাকি আজও ঐ জংগলে ঠিক তেমনটিই শুয়ে আছি বলে মনে হল। নিদ্রা যে কখন এসে চোখের পাতা দুটা বুঁজিয়ে দিয়েছিল, তা বুঝতেই পারি নি।

রেংগুন নিবাসী শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ দে অনেকদিন আমার সংগে ছিল। স্বপ্নে দেখতে লাগলাম, সে আমার মুখের উপর শ্বাস ছাড়ছে। এটা আমি মোটেই পছন্দ করি না। তাই তার মুখকে সরিয়ে দিতে যেই হাত উঠিয়েছি অমনি ঘুম ভাংল। চোখ খুলে দেখি, আমি জংগলে, লোকালয়ে নই। যাকে ঠেলে দিয়েছি, তিনি একজন শৃগাল নিশ্চয়ই, নতুবা হাতের ধাক্কায় বাঘ পালায় না। বসে বসে অনেকক্ষণ হাসলাম, একটা সিগারেট ধরিয়ে তার সদ্ব্যবহার করলাম। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম যখন ভাংল, তখন তরুণ অরুণের আলো পাইন বৃক্ষের ছাতাবাঁধা পাতা ভেদ করে আমার সামনে ঝিলমিল করছে। ইচ্ছা হল, যে গাছটার নিচে শুয়েছিলাম তাকে আলিংগন করি। যখন তার নিচে শুয়েছিলাম, তখন বৃক্ষ তার নিচে শোওয়ার জন্য ভাড়া চায় নি, অথবা এখন চলে যাব বলেও কিছু চাচ্ছে না। কিন্তু চিন্তার ধারা বদলে গেল, মনে হল গাছের চাইবার ক্ষমতা নাই। যদি চাইবার ক্ষমতা থাকত, তবে কি আমাকে ছেড়ে দিত? বৃক্ষের দিকে চেয়ে কতক্ষণ হাসলাম।

পথে এসে কতক্ষণ চলার পরই গুণ্যক দেখতে পেলাম। শহরটা বেশ বড়। সেজন্য মনে বেশ আনন্দ হল। এখানে জেন্দআর্ম নাই, সুতরাং কেউ আমাকে বিরক্ত করতেও আসবে না ভাবছিলাম কিন্তু শহরের মাঝে একটু যেতে না যেতেই একদল ছেলে আমার পেছন নিল। তাদের প্রবল ইচ্ছা তারা আমার সংগে কথা বলে। নিজকে ছেলেপিলে এবং যুবকদের কাছ থেকে বাঁচাবার জন্য,

পথের পাশে দণ্ডায়মান একটি পুলিশের কাছে গিয়ে বললাম কাফিখানা দেখিয়ে দিতে কিন্তু পুলিশটি একদম আমাকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে গেল। সেখানে বসেই কাফি খেলাম এবং বিশ্রাম করলাম। অনুভব করলাম, আমার গিতিবিধি যেন নিয়ন্ত্রিত হতে চলেছে। বাইরে আসবার জন্য যখনই চেষ্টা করেছি তখনই একজন লোক আমাকে বাধা দিচ্ছিল। শেষটায় একজন পুলিশ আমাকে হোটেলে নিয়ে গেল এবং খাবার থাকবার বন্দোবস্ত করে দিল। সেদিনকার খরচ বাবদ আমি এক পয়সাও দিই নি। যেথানে আমার স্বাধীনতা নাই, সেখানে আমার সততা আপনা হতেই চলে যায়।

দ্বিপ্রহরের খাদ্য হোটেলেই এনে দেওয়া হল, কারণ হোটেলওয়ালাকে বলা হয়েছিল, আমি যেন হোটেলের বাইরে না যাই। হোটেলের সামনে অন্তত পাঁচশত যুবকযুবতী এবং ছেলেপিলে জমা হয়েছিল। দরজা বন্ধ রাখার জন্য হোটেলওয়ালাকে অনেকে গালি দিয়েছিল, অনেকে আবার ঢিলও ছুঁড়েছিল। যখন ঢিল ছোঁড়া হচ্ছিল, তখন আমি বারান্দায় এসে তাদের হাত জোড় করে চলে যেতে বলেছিলাম। আমার কথা নতুনের দল শুনেছিল এবং আপনা হতেই সকলে চলে গিয়েছিল।

বিকালে বেরুবার সময় হোটেলওয়ালা বাধা দিল না। আমি একটা ময়দানের দিকে চললাম। এরই মাঝে কতকগুলি লোক এসে নানা কথা জিগ্‌গাসা করতে লাগল। আমি পথের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের কথার জবাব দিতে লাগলাম। হঠাৎ কোথা হতে একজন পুলিশ এসে ইংগিতে তার সংগে যেতে বলল। ওর সংগে ফের পুলিশ স্টেশনে গিয়ে হাজির হলাম। পুলিশের সবচেয়ে বড় অফিসার এসে বললেন, আপনার সংগে কথা বলবার জন্যই আপনাকে ডাকিয়েছি এবং এই কথা বলেই তিনি চলে গেলেন। ছেলেপিলের দল বীতশ্রদ্ধ হয়ে পুলিশের উপর পাথর ছুঁড়তে লাগল। পাথর ছোঁড়া সমাপ্ত হবার পর বড় অফিসার বের হয়ে এসে ছেলেদের উদ্দেশ্য করে একটা বক্তৃতা দিলেন। তারা সকলেই মাথা নত করে চলে গেল। তিনি কি বললেন তার কিছুই বুঝলাম না। ছেলেপিলে বিদায় হয়ে যাওয়ার পর আমাকেও হোটেলে পাঠিয়ে দিলেন, কথা কিছুই হল না। আমার চিন্তা হল, এখানকার পুলিশ আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার কেন করছে ?

রাত্রে ভাল ঘুম হল না। পরদিন প্রাতেই রওনা হব বলে পুলিশ স্টেশনে

গিয়ে পাসপোর্ট চাইলাম। সকলেই পুলিশ স্টেশনে হাজির তবুও কেউ এসে কথা বলল না। ভেতর হতে একজন ইংলিশে প্রশ্ন করে পাঠালেন—

১। আপনি কি রেলে হাইদরপাশা যেতে চান? ২। আপনি নৌকাযোগে না সাইকেলে স্তাম্বুল যাবেন? ৩। আপনার সংগে কি ক্যামেরা ও কম্পাস আছে?

প্রশ্নগুলির জবাব পাঠালাম—আমি সাইকেলে হাইদরপাশা যেতে চাই এবং আমার সংগে ক্যামেরা অথবা কম্পাস নাই।

আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে দ্বিতীয় অফিসার এসে হিন্দুস্থানী এবং ইংলিশ মিশিয়ে নানা কথা বলতে লাগলেন। তার মধ্যে নানারূপ হাসির কথাও ছিল। তিনিও একদিন যুদ্ধের কয়েদী রূপে ভারতে আটক ছিলেন। আটক অবস্থায় বেশ ভাল ব্যবহারই পেয়েছিলেন বললেন, তবে এই ভাল ব্যবহার ব্রিটিশের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, 'হিন্দুদের' কাছ থেকে নয়। 'হিন্দুদের' মধ্যে যারা মুসলমান ধর্মাবলম্বী তারাও ভয়ে তাদের কাছে যেত না, একথাটা বার বার বললেন। তার অন্তর্নিহিত অর্থ আমি বেশ ভাল করেই বুঝলাম। এটাও বুঝলাম, তাঁর কাছ থেকে আমার সুব্যবহার পাবার অধিকার নাই, কারণ আমরা যে কিরূপ জীব তা তিনি বুঝে নিয়েছিলেন।

বেলা এগারটার সময় আমাকে বিদায় দিয়ে তিনি বললেন আমার সংগে একজন অশ্বারোহী জেন্দআর্ম যাবে। আমি তাতেই রাজী হলাম। এরূপ স্থানে কে বসে থাকতে চায়? ঘোড়সওয়ার আমার পেছনে আর আমি সাইকেলে আগে আগে যেতে লাগলাম। মাইল পাঁচেক যাবার পর অশ্বারোহীকে পরিশ্রান্ত বোধ হওয়ায় তাকে আমার ব্যাগ হতে রুটী বার করে খেতে দিলাম। মাইল কুড়ি চলে এসে আমরা সমুদ্রতীরে এসে উপস্থিত হলাম। সেখান থেকে আমরা পুলিশ স্টেশনে গিয়ে হাজির হলাম। জেন্দআর্ম আমাকে পুলিশ স্টেশনে রেখেই বিদায় নিল। পুলিশ অফিসার আমাকে তাদের অফিসের দোতলায় একটা ছোট কুঠুরিতে আটক করে রেখে বাহির হতে দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

সেই দিনটা ছিল একটু গরম। পথশ্রান্ত হয়ে যখন শহরে এসেছিলাম, ভেবেছিলাম একটু স্নান করে আরাম করব। তা আর হল না। যে ঘরটাতে আমাকে আবদ্ধ করা হয়েছিল তার দশ হাত দূরেই সমুদ্র। সমুদ্রের জল পরিষ্কার। সেই জলে স্নান করতে ইচ্ছা হচ্ছিল কিন্তু ঘর হতে বার হবার

উপায় ছিল না। কতক্ষণ আবদ্ধ থাকব তাও অনুমান করতে পারিনি। মাঝে মাঝে পুলিশ এসে জিগ্‌গাসা করছিল সিগারেট আনবে কি না, জল খাব কি না অথবা আর কিছুর দরকার আছে কি না ?

রুদ্ধ কক্ষে বসে ভাবতে লাগলাম, এজন্যই এদেশে পর্যটক আসতে ভয় করে। কিন্তু এরূপ করে আবদ্ধ রাখবার কারণ কি ? যাক, আবদ্ধ রাখ আমার তাতে বয়ে গেল। এটাও একটা অভিগ্‌গতা। বেলা সাড়ে চারটার পর আর একজন লোক এলেন। তিনি বেশ ইংলিশ বলতে পারেন। আমাকে জিগ্‌গাসা করলেন—

আপনি কোথায় এসেছেন জানেন ?

এ স্থানের নাম জানি না।

এটা যে নিষিদ্ধ স্থান সে কথা কেউ আপনাকে বলে নি ?

নিশ্চয়ই না। বললে আসতাম না।

এই হয়েছে উভয় পক্ষের ভুল। এখান হতে আপনাকে হাইদরপাশা পর্যন্ত রেল গাড়িতে যেতে হবে। রেলের ভাড়া দেবার টাকা আছে ?

সেরূপ টাকা নিয়ে আমি বের হই নি।

আচ্ছা তার বন্দোবস্ত করছি। নিষিদ্ধ স্থান বলেই এরূপ কষ্ট আপনাকে পেতে হচ্ছে। তুরুক ছাড়া আর কাউকে এ অন্‌চলে বেড়াতে দেওয়া হয় না।

এই বলেই আগন্তুক চলে গেলেন। কতক্ষণ পর ফের এসে বললেন, চলুন আর সময় নাই, এখনই গাড়ি ছাড়বে। তৎক্ষণাৎ ঘর হতে বার হয়ে তার সংগে চললাম। রেল স্টেশন নিকটেই, কিন্তু সমুদ্রতীর হতে রেল স্টেশন পর্যন্ত স্থানটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। পথের দু'দিক দেখে চলেছি, এমন সময় সংগীটি বললেন, চারদিকে অমন করে তাকাবেন না, এখানেই আমাদের হৃদ্‌পিণ্ড। বুঝতে পারলাম এ অন্‌চলের প্রত্যেকটি পাহাড়ে কামান গোলা-গুলি ও অন্যান্য যুদ্ধ-সরম্‌জাম মজুত আছে। মাথা নত করে স্টেশনে গেলাম। সেখানে আমাকে হাইদরপাশা পর্যন্ত যাবার একখানা টিকিট দেওয়া হল। গাড়িতে খাবার জন্য ছোট একখানা রুটি দিতেও ভুল করেন নি। মনে মনে ভাবলাম ওঁরা আমাদের দেশে যুদ্ধের কয়েদী রূপে যে ব্যবহার পেয়েছেন সে কথা এখনও ভুলতে পারেন নি।

গাড়িতে উঠবার পূর্বে ভদ্রলোক বললেন, তুর্কীতে এরূপ কএকটি আরও স্থান্

পাবেন। যখন আপনি আদের্নে ( আদ্রিয়ানোপলে ) যাবেন, তখন এরূপ আর একটি স্থান পাবেন। সেখানে পুলিশের লোক সব সময় মোটর বাস নিয়ে বসে থাকে। বিদেশের কোন লোক এলেই তাকে নিষিদ্ধ স্থানটুকু পার করে দেয়। দুঃখের বিষয় এদিকে পর্যটক আজ পর্যন্ত আসেন নি, সে জন্যই সেরূপ কোন বন্দোবস্ত হয় নি। আশা করি দুঃখিত হবেন না। আমাদের দেশ ক্রমাগত বিদেশী দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। আমরা অনেক যুদ্ধ করেছি। যে আরবকে ধর্মের সৌজন্যে আপন ঘরে স্থান দিয়েছি, সেই আরবগণই ঘরের সংবাদ অপরের কাছে সামান্য অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করেছে। এখন থেকে বিদেশীকে আর বিশ্বাস করা হয় না।

আপনি কি আমাকে আরব ভেবেছেন ?

আপনি আরব ছাড়া আর কি হতে পারেন ?

আমি একজন হিন্দু।

কই, সে সংবাদ তো কেউ আমাকে দেয় নি। বলুন তো আপনাদের দেশের গান্ধী কেমন আছেন ?

তিনি নিশ্চয়ই ভাল আছেন।

আপনার কাছে যদি তাঁর কোন পত্র থাকে, তবে আমাকে দিন। আমি তা আপনার কাছ থেকে কিনে নেব।

চটপট করে জবাব দিলাম, এখন আর আমার কাছে সেরূপ কিছুই নেই, ক্ষমা করবেন মহাশয়।

ভদ্রলোক একটু দুঃখিত হলেন, তাঁর মুখ দেখেই তা আমি বুঝেছিলাম। কিন্তু উপায় নাই। মিনিটের মধ্যে গাড়ি ছাড়বে, গাড়িতে গিয়ে বসলাম। মেইল গাড়ি। বেশীক্ষণ না দাঁড়িয়ে, নিষিদ্ধ স্থানের ভেতর দিয়ে প্রবল বেগে গাড়ি চলল। গাড়িতে বসে ভাবতে লাগলাম, মহাত্মা গান্ধীর কথা। তাঁর কাছ থেকে পত্র পাওয়া আমার মত লোকের পক্ষে সম্ভবপর নয়। আতা তুরকের একজন সেক্রেটারী আছেন, তাঁর কাজই হল, সর্বসাধারণের পত্রের জবাব দেওয়া। এদের ধারণা, ভারতীয় বাইসাইকেল-পর্যটক অথবা পদব্রজে পর্যটক রাষ্ট্রনেতাদের দ্বারাই পরিচালিত হন। কিন্তু আমাদের দেশের রাষ্ট্রনেতাগণ পর্যটনকে এখনও ভবঘুরে বৃত্তি বলেই মনে করে থাকেন। মহাত্মা গান্ধীর সংগে সাক্ষাৎ করবার জন্য চেষ্টা করি নি, তবে অন্যান্য কএকজন নেতার সংগে সাক্ষাৎ

করবার চেষ্টা করে অকৃতকার্য হয়েছি। তাঁরা প্রত্যেকেই এক এক জন বড়লোক। পৃথিবীর যত প্রসিদ্ধ লোক আছেন, ভূপর্যটক রূপে তাঁদের অনেকের সংগে সাক্ষাৎ করার সুবিধা পেয়েছি, কিন্তু স্বেচ্ছায় দেখা করি নি। দুঃখের বিষয় ভারতের খুদে নেতাদের সংগে সাক্ষাৎ করতে প্রয়াসী হয়েও দেখা পাই নি।

এরূপ হয় কেন? যাঁদের কাছ থেকে আমরা আধুনিক শিক্ষা পেয়েছি ও পাচ্ছি, তাঁদের কায়দা-কানুন আমাদের দেশের নেতারা গ্রহণ করেছেন। বিদেশীরা এসেছেন রাজ্য শাসন করতে, তাই তাঁদের আচার-ব্যবহার অনেকটা কৃত্রিম। তাঁদের কৃত্রিম ব্যবহারের অনুসরণ করা আমাদের নেতাদের উচিত হয় নি।

যাঁরা লেনিন, স্ট্যালিন, চিয়াং কাই শেকের জীবনী পাঠ করেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন, নেতাদের জীবন শুরু হয়েছে দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে। আমাদের দেশের নেতাদের জীবন শুরু হয়েছে প্রাচুর্য ও অপরিমিত বিলাসের মধ্যে। প্রভেদ এইখানেই। তারপর আমাদের দেশের নেতারা চান ব্রিটিশকে তাড়িয়ে দিয়ে ব্রিটিশের স্থানে নিজেরা বসতে। মজুর, কৃষক, হরিজন, ছোটলোক যেখানে ছিল, সেখানেই থাকবে। সেজন্যই বোধ হয় তাঁরা ছোটলোক অথবা বিত্তহীন শ্রেণীর ভূপর্যটককে দর্শন দিয়ে উঁচুতে উঠাতে চান না। কলকাতার এক সংবাদপত্রের মালিক বলেছিলেন—ছোটলোকের ছেলেটাকে পাব্‌লিসিটি বেশী দেবেন না। একথাটা স্বকর্ণে শুনে মনে হয়েছিল—তোমরা বড়লোক, আর আমরা ছোটলোক, আমাদের গ্যানের মূল্য নেই, কাজের মূল্য নেই, আমরা মানুষ নই।

গাড়ি কোন সময় গিয়ে হাইদরপাশা উপস্থিত হয়েছিল, তার খেয়াল আমার ছিল না। আমার মনে হচ্ছিল, আমি ভারতের কোথাও কোনও রেলগাড়িতে বসে আছি। একজন ভদ্রলোক বললেন এখান হতে নেমে গিয়ে স্তাম্বুল যেতে হবে। গাড়ি হতে নেমে, পিঠ-ঝোলাটা পিঠে চড়িয়ে ফেরির দিকে চললাম। ফেরি বোট আসছে এবং যাচ্ছে। ঠিক করলাম পরের ট্রিপে যাব।

ওপারে দাঁড়িয়ে আমি একা। কেউ আমাকে চিনে না, জানে না, কেউ আমাকে দেখে না। আমি দাঁড়িয়ে আছি লোকারণ্যের মাঝে ঐ স্তাম্বুল নগরীর দিকে তাকিয়ে। নগরের দৃশ্য বেশ জমকালো হয়ে ফুটে উঠেছিল আমার মনে। ফেরি বোটটা ফিরে আসবে, আর আমি উঠব সেই বোটে, পৌছব্ গিয়ে

ইউরোপের বীরভূমিতে। স্তাম্বুল, ধন্য নগরী তুমি। তোমার দ্বারে এসে মনে হয়, ইউরোপের বীরত্ব, স্বাধীনতার জন্য রক্ত দান যেন এখান হতেই রক্তগংগা রূপে উজান বয়ে গিয়ে সমস্ত ইউরোপ ভাসিয়ে দিয়েছে। এই তো সামনে বস্‌ফরাস। কেমন নীল তার জল, কত গভীর সে প্রণালী! তার বুকে যতগুলি অর্ণবপোত ভাসছে, আমার মনে হয়, তারা যেন এক একটি বজ্র, কখন সামান্য বিজলী ছুটবে, আর ফুটে উঠবে আগুনের গোলা। কিন্তু আমার আজ আনন্দ। তোমার বুকের উপর বসে ভাবব, নীল জলের কথা নয়,—লাল জলের কথা, আর যুগ-যুগান্ত হতে ইউরোপের শান্তি এবং অশান্তির সংগে জড়িত ঐ বিশাল বপুধারী বীর তুরুকদের কথা। তারা ভাবে না, কিসে তাদের মংগল হয়। তুমি যেমন সদাসর্বদা তরংগায়িত থাক, তেমনি ঐ তুরুকগুলি তোমারই তালে তালে রণমদে মত্ত থাকে, তা ধর্ম নিয়েই হোক, আর ধর্মকে তাড়াতেই হোক। তুমি মানুষের মনের প্রতিবিম্ব স্বরূপ, তোমার বুকের উপর যখন পরিবর্তনের বান ডাকে তখন জগৎ কাঁপে। তোমার নীল জলের নীলিমা ফুটে ওঠে সব সময়ে, সর্বকালে প্রভাতী সূর্যের রক্ত আলোকে।

ওপারে আর বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা হল না। বোঝাই সাইকেল ঠেলে নিয়ে ফেরি জাহাজে উঠলাম। ফেরি জাহাজ যদিও ক্ষুদ্র, তবুও শক্ত। যখন ইচ্ছা তখনই তাকে গান-বোটে পরিণত করার ব্যবস্থা রয়েছে। সাইকেলটা ঠেলে নিয়ে একদিকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম সৌন্দর্য—যেখানে কৃষ্ণসাগর এবং বস্‌ফরাস মিলিত হয়েছে। জল প্রবল বেগে ছুটে চলেছে। ছোট জাহাজ তীব্র জলস্রোত তুচ্ছ করে পাড়ি দিচ্ছে। ওপারে যাবার জন্য আমার কাছে টিকেট ছিল না, ভেবেছিলাম হয়তো কেউ আমার কাছে টিকেট চাইবে না, কিন্তু মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই একদল লোক এসে আমার কাছে টিকেট চাইল। পকেট হতে ত্রিশ ক্রোশন দিয়ে টিকেট কিনলাম, তারপর আবার সাগর-সম্মিলনের দৃশ্য দেখতে লাগলাম।

কুড়ি মিনিটের মধ্যেই জাহাজ, ওপারে এসে ভিড়ল। সাইকেলটা টেনে নিয়ে এসে বিদ্রোহীদের জন্মভূমি মানবতার নববিকাশের লীলাভূমি ইয়োরোপের ভূমি স্পর্শ করে মনটা আনন্দে নেচে উঠল। তখনই মনে হল—এদেশেরই লোক একদিন অসভ্যতার অন্ধকারে যখন জংগলে জংগলে বেড়াত তখন আমাদের দেশের লোক সভ্যতার উচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে জগতের দিকে চেয়ে হাসত। তাঁরই

ফলে বোধ হয় আজ আমরা কাঁদছি, আর ওরা ক্রমেই এগিয়ে চলেছে। সাইকেল নিয়ে যখন সমুদ্র-তীরে উঠছিলাম, তখন আমার পরনের পোশাক অপরিষ্কার ছিল। মাথার টুপিটা ধূলোয় ভরতি ছিল, মুখ আমার শুষ্ক ছিল। এমন অবস্থায় সিঁড়ি-দেওয়া পথ দিয়ে যখন সেতুর উপর গিয়ে উঠলাম, দেখতে পেলাম এই সেই পৃথিবী-বিখ্যাত সেতু। এর নাম আমি জানি না, জানতে চাইও নি। শুধু আমি এই জেনেছি যে, এই সেতুর ওপর দিয়েই একদিন তুরুক জাত এসে স্তাম্বুল আক্রমণ করেছিল, গীর্জাকে মসজিদে পরিণত করেছিল, লোককে ফেজ পরিয়েছিল। আর আজ এই সেতুর উপর দিয়ে যারা চলাফেরা করছে, তারা প্রত্যেকেই ইউরোপীয় পোশাকে সজ্জিত। সেতুর উপর ট্র্যাফিক মন্দ নয়, তার প্রস্থ হবে কলকাতার চৌরংগী রোডের সমান। দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, এখন কোন দিকে যাই, সামনে না পিছনে ?

একজন লোক পিছন থেকে এসে বললে, হোটেলে যাবেন ?

আমি তাকে বললাম, এমন হোটেলে যেতে চাই যেখানে একরূপ বিনা পয়সায়ই থাকতে পারা যায়।

ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে বললেন, দেখছেন না আপনি এ পারে ? যতক্ষণ ওপারে ছিলেন, ততক্ষণ বিনা পয়সায় থাকা খাওয়ার প্রত্যাশা করতে পারতেন, এ যে ইউরোপীয় তুর্কী, এস্থানে অন্য ভাবে চলতে হবে। তবে ভয় নেই, আমি একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

ভদ্রলোক একটু দাঁড়িয়ে থেকে একজন সিভিল পুলিশকে বললেন, ইনি পর্যটক, এঁকে একটা কম দামী হোটেল দেখিয়ে দেওয়া আপনার কর্তব্য—অতএব নিয়ে যান।

পুলিশ বেচারী কি আর বলবে ? জাত ভাইয়ের চাকর, জাতের মর্যাদার জন্যই হোক, আর কর্মের নিষ্ঠার জন্যই হোক, নিয়ে চলল আমাকে একটা তুর্কী হোটেলের দিকে, কিন্তু পেরে উঠল না কিছুই করতে। যেখানে গিয়েছি, সেখানেই থাকার দাম বেশী শুনে ফিরে আস্‌তে হয়েছে। শেষটায় একজন তুর্কী তরুণ আমার হাত ধরে নিয়ে চললেন তাঁরই ভ্রাতার হোটেলে। তাঁর মুখটা দেখলে মনে হয় যেন লোকটি রক্তখেকো, কিন্তু অন্তরটা তাঁর দয়ায় পূর্ণ। বীরত্ব যাদের আছে, তাদের বাহিরটা থাকে রুক্ষ, ভেতরটা থাকে ভালবাসায় পূর্ণ, কিন্তু কর্তব্য তাদের ভুলিয়ে দেয় ভালবাসা। হোটেল ঠিক করে দিয়েই তিনি চলে

গেলেন। যখন ফিরে এলেন, তখন তাঁর হাতে ছিল প্লেট ভরতি খাবার, আর সংগে ছিল ইংলিশ-জানা একজন লোক। ইংলিশে অভিগ্‌গ লোকটির কাছে আমার সমুদয় ভ্রমণ-কথা শুনে যুবক সুখী হলেন এবং বার বার বলতে লাগলেন. যদি আমি ফরাসী ভাষা জানতাম তবে কতই না তাঁর আনন্দ হত।

যদি আজ তুরুক জাতের ধর্মান্ধতা থাকত, তবে ওদের কাছ থেকে যে সাহায্য এবং সহানুভূতি পেয়েছি, তা পাওয়া দুষ্কর হত। আমাদের কথা ছেড়ে দিই, অনেক ইউরোপীয় সভ্য জাতের মধ্যেও ধর্মের সংকীর্ণতা দেখে অনেক দিন ক্ষেপে উঠেছি। আতা তুরুকের কৃপায় আজ রাষ্ট্র এবং জাতীয় ভাব হতে ধর্মের প্রভাব নিশ্চিহ্ন হয়েছে। আমার ইচ্ছা ছিল, এই জীর্ণ শরীর নিয়েই স্তাম্বুলের পথঘাট বেড়িয়ে দেখি, কিন্তু যুবক আমাকে বাইরে যেতে নিষেধ করলেন।

কথা হয়েছিল, প্রত্যেক রাত্রে শোবার জন্য আমাকে পঁয়ত্রিশ ক্রোশন করে দিতে হবে কিন্তু আমার কাছে তা ছিল না। উত্তম শয্যায় শয়ন, সুখাদ্য ভোজন প্রভৃতি যদিও লোভনীয়, তবুও প্রভাতে উঠে কি করে বিছানার ভাড়া শোধ করতে পারব, সেই চিন্তা মনকে ক্রমাগত উৎপীড়ন করতে লাগল। সাহায্যকারী বন্ধু জিগ্‌গাসা করেছিলেন, ভারতবর্ষের কোনও প্রতিষ্ঠান আমাকে টাকাকড়ি দিয়ে সাহায্য করে কি না। মনে হল এসব কথা উপহাস মাত্র, ভারতবাসী এখনও আপনার নিজের অবস্থা বিদেশীকে বোঝাবার জন্য পর্যটক পাঠিয়ে অর্থ ব্যয় করা অপব্যয়ই মনে করে।

সময় আমার জন্য অপেক্ষা করলে না। হোটেলের ঘড়িতে ঢং ঢং করে এগারটা বেজে উঠল। আমার মনে আছে সে রাত্রে তিনটা পর্যন্ত অভাবের চিন্তায় আমার ঘুম আসে নি। আমি কারও প্রতি কোনরূপ রাগ কিংবা বিদ্বেষ সে সময় মনে পোষণ করি নি। মনে মনে ভেবেছিলাম, যে আর্থিক নিয়ম একজনকে ধনী এবং অপরজনকে দরিদ্র করে, সেই নিয়ম পৃথিবী হতে কবে বিদায় নেবে।

প্রভাত হল। ঘুম হতে উঠে মনে হল, এখানে কোন হিন্দু আছে কি না খুঁজে দেখি। বেশীক্ষণ খুঁজতে হল না। এখানে আমি মাত্র গতকল্য রাত্রিতে এসেছি, এবং যদিও কোন সংবাদপত্রের অফিসে যাই নি তথাপি আমার আসার সংবাদ তুর্কীর সমস্ত সংবাদপত্রে মুদ্রিত হয়েছে দেখে বিস্মিত হলাম। একজন কৃষ্ণবর্ণ লম্বা প্রৌঢ় দেশী ভাই এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বললে, 'আপ মিঃ

বিশ্বাস হায় ?' আমি নিজের পরিচয় দিয়েই তাকে আলিংগন করলাম। সে গদ্‌গদ্ স্বরে তার দুঃখের নানা কথা বলল।

জিগ্‌গাসা করে জানলাম সে তুর্কীর প্রজা নয়, এদেশে এসে কারবার করছিল। কারবারে সে ফেল করে। তুর্কীর প্রজা নয় বলে মজুরীও পাচ্ছিল না, সেজন্যই তার আর্থিক দুরবস্থা। গত কল্য থেকে লোকটি অভুক্ত আছে শুনে আমার কাছে যে কটি ক্রোশন ছিল তা দিয়ে কিছু খাবার কিনলাম এবং দুজনেই কিছু কিছু খেলাম।

আমরা বেরিয়ে যাবার জন্য দরজায় এসেছি, এমন সময় আরও দুজন ভারতবাসী এলেন। আমাকে পেয়ে তাঁদের কি আনন্দ! কিন্তু নিরানন্দ এল, যখন আমার প্রথম পরিচিত লোকটি তুর্কী ভাষায় তাঁদের জানালেন যে আমার হাতে টাকা নেই। আগন্তুকরা ভেবেছিলেন, আমি হয়তো একজন বেশ বড়লোক হব, নতুবা আমার নাম সংবাদপত্রে বের হয় কেন ? মুখের ভাব বদল করে ওঁরা অন্য কথা বলতে লাগলেন। আমি তাদের জানালাম, রেস্তোরাঁয় বসে থাকলে চলবে না, বাইরে যেতে হবে টাকার সন্ধানে।

ওদের বিদায় দিয়ে প্রসিদ্ধ সেতু পার হয়ে একটা বড় পথ ধরে এগিয়ে চললাম। পথটা ক্রমশ একটা টিলার উপর উঠেছে। পথের দুদিকে বড় বড় দোকান। যত দামী জিনিসপত্র এ রাস্তায়ই বিক্রি হয়। এই পথটা ধরে চলার উদ্দেশ্য হল, এই পথেই নাকি একজন হিন্দুর মণিমানিক্যের দোকান আছে। অনেকের কাছেই জিগ্‌গাসা করলাম সে জহুরীর কথা। কিন্তু কেউ বুঝল না আমার কথা, তবু পূর্ণোদ্যমে চলতে লাগলাম জনাকীর্ণ পথ ধরে।

দ্বিপ্রহর হয়েছে। হোটেলই বা কোথায়, আর আমিই বা কোথায় ? পথ হারিয়ে বসেছি। একদিকে পেটের ক্ষুধা, অন্যদিকে চিন্তা—যদি হোটেলে সময় মত না ফিরতে পারি তবে হোটেলের মালিকই বা কি ভাববে ? চিন্তা এসেছিল আমাকে হয়রান করতে, শরীরে যে সামান্য শক্তিটুকু আছে তাও কেড়ে নিতে। কিন্তু তা আমি হতে দিই নি। মনে যে অবসাদ এবং শরীরে যে দুর্বলতা এসেছিল, সে সমস্ত তাড়িয়ে দিয়ে আবার পথের সন্ধানের কথা জিগ্‌গাসা করে এগিয়ে চললাম।

একজন গ্রীক ভদ্রলোকের সংগে সাক্ষাৎ হল। তাঁর নাম নিকলাস। তিনি দয়ার্দ্র চিত্তে আমার সংগে কথা বলতে লাগলেন। প্রধানত ভারতীয় দর্শনেই

কথাগুলি সীমাবদ্ধ ছিল। কথা বলতে বলতে আমরা একটা রেস্তোরাঁয় গেলাম। রেস্তোরাঁর মালিক তাঁকে বেশ সম্মান দেখালেন। ভারতের দর্শন নিয়ে নাড়াচাড়া করে যদি কোনও অশ্বডিম্ব বের হয়, তবে তা প্রাপ্য হবে আমারই। বেশীক্ষণ দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে কথা চালাতে পারলাম না, ক্ষুধার্ত উদর বারবার তার দাবী জানাচ্ছিল। অবশেষে বাধ্য হয়ে নিকলাসকে আমার অর্থাভাবের কথা বললাম। তিনি তৎক্ষণাৎ আমার সাময়িক অভাব পূরণ করে দিলেন এবং নিজে হোটেলের পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন।

আমার মন অনেকটা শান্ত হল, হোটেলে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। কিন্তু চিন্তা আমাকে ছাড়ল না। ভাবতে লাগলাম আমাদের দেশের যে-সব টাকাওয়ালা লোক ইউরোপে বেড়াতে যান, তাঁরা টাকার অহংকারে মত্ত থাকেন। কোথা হতে টাকা আসে, সে কথা একবারও ভাবেন না। যাঁরা বুঝতে পারেন টাকা কোথা হতে আসে, তাঁরা ইউরোপ বেড়াতে যান না বললেও চলে। সে জন্যেই ইউরোপ-ফেরত ধনী ভবঘুরের দল প্যারি এবং অন্যান্য সহরের— যেখানে ভোগ-বিলাসের তৃপ্তি বেশ ভাল করে হয়, তারই নানা কথা লিখে আমাদের উপহার দিয়েছেন।

মিঃ নিকলাসের সংগে যখন বন্ধুত্ব গাঢ় হয়ে উঠল তখন জানতে পারলাম, তাঁর পিতা ডাক্তারী করে স্তাম্বুলে সাতখানা বাড়ি করে গেছেন। অথচ নিকলাস নগ্ন মাথায় রুক্ষ কেশে স্তাম্বুল শহরে দরিদ্রের মত হেঁটে বেড়ান। তাঁর এই স্বেচ্ছা-দারিদ্র্যের একটা কারণ আছে। তিনি রাজতন্ত্রী। রাজা যখন রাজত্ব করতেন তখন তিনি এথেন্সে গিয়েছিলেন। রাজা জর্জের বিদায়ের সংগে তাঁরও বিদায়ী পরওয়ানা এল। কিন্তু সোজা পথে তিনি স্তাম্বুলে ফিরে আসতে সক্ষম হন নি। তাঁকে স্তাম্বুলে পালিয়ে আসতে হয়েছিল রুমানিয়া হয়ে, কারণ তিনি রাজতন্ত্রী। এর পর হতে তিনি এই স্তাম্বুলেই আছেন। মাঝে মাঝে দেশের কথা মনে পড়লেই তাঁর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। কিন্তু দেশে যাবার উপায় নাই। মিঃ নিকলাসের প্রতিগ্‌গা, যতদিন রাজা জর্জ এথেন্সের সিংহাসনে না বসবেন, ততদিন তিনি মাথায় টুপি পরবেন না। শীত হউক আর গ্রীষ্ম হউক, এর কোন পরিবর্তন হয় না।

মিঃ নিকলাস বিদায় নেবার সময় বলে গেলেন, বিকালে এসে টাকার যোগাড় করবেন এবং যা তিনি আমাকে ধার দিয়েছেন তা ফেরত নেবেন। মিঃ

নিকলাসের রাষ্ট্রনৈতিক গ্যান এবং অভিমত যদিও তাঁরই দেশের লোকে অবহেলা করছে, তবুও তাঁর এই সদয় ব্যবহার আমাকে অনেকটা আশ্বস্ত করেছিল।

যদিও চোখ জুড়ে নিদ্রা আসছিল, তবুও নিদ্রা যাবার উপায় ছিল না কারণ আমার আশ্রয়দাতা তুর্কী যুবক তার বন্ধুবান্ধব, বিশেষ করে তার যুবতী বান্ধবীকে নিয়ে আমার সংগে কথা বলতে এসেছিলেন। বান্ধবী একা ছিলেন না, সংগে তাঁর সখীও ছিল। ওদের দিকে চেয়ে আমার মাথা নত হয়ে এল, যুবতীগণ আমার সেই ভাবটি লক্ষ্য করেছিলেন।

কিসের জন্য আমার মাথা নত হয়েছিল তার কারণ স্বরূপ বললাম, ওটা আমার স্বভাবের দোষ নয়, যে সমাজে জন্মেছি সে সমাজের দোষ। আমার একথা শুনে আগন্তুকরা সবাই মর্মাহত হলেন। সবাই বললেন এই পাপকে দূর করতে হলে নারীর স্বাধীনতা স্বীকার করতে হবে। পুরুষ চিরদিনই তাদের নিজেদের তৈরী আইনের দ্বারা নারী নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। আমি বললাম, আমাদের দেশের পুরুষরাও স্বাধীন নয়, তারা নারীর সম্মান কি করে বুঝবে? সরদা-আইনের কথা আমার মনে পড়লেও সংগে সংগে মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণার কথাও মনে পড়ল। রাজশক্তির সামাজিক আইনকানুনে হাত দেবার শক্তি নেই। ব্রিটিশ-রাজ ভারতে এই ঘোষণা মেনেই চলছেন।

আমাদের কথা বেশীক্ষণ চলল না। একটি তুরুক যুবক এসে আমাকে বিশুদ্ধ ইংলিশে বলল, আপনি নাকি খুব অভাবে আছেন? কথাটা ব্রিটীশ কনসালের কানে গেছে। যদি আপনি তাঁর সাহায্য চান, তবে বন্দোবস্ত করতে পারি।

এর কথাটা শুনেই মনে হল, এ আবার কোন্ চালবাজী। জাপানী ফকিরের ভিক্ষা, জাপানী রিকসাওয়ালা, ছাত্র, বই-বিক্রেতা এদের মত কিছু নয় তো! কোথাও কোথাও ভ্রমণ-পিপাসু উৎসাহী যুবকবৃন্দের নানারূপ প্রাণস্পর্শী আবদার অনেক শুনেছি। এসব অভিগ্‌গতার ফলে আমার মত সহজ প্রকৃতির লোকও বুঝতে পারল যে এ এক নূতন চাল। দেখা যাক এই চাল,—কোথায় এর শেষ।

আমি বললাম, আপনার কাছে এমন কোন নিদর্শন আছে কি, যাতে আমি বুঝতে পারি যে, আপনার সংগে বৃটীশ কনসালের সম্পর্ক আছে? যুবকটি তৎক্ষণাৎ ব্রিটীশ অ্যামবেসেডারের একখানি কার্ড দেখাল। কার্ডখানি হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলাম এবং ফেরত দিয়ে ভাবলাম, এ তো মজার চাল। তারপর বললাম, কিন্তু আমি তো কারও কাছে টাকা চাই নি, আমার টাকার

প্রয়োজন আপনি কি করে জানলেন ? আমি এদেশে টাকা কামাতে আসি নি। আমি পথিক মাত্র, আমার শুধু খাবার এবং থাকবার স্থানের দরকার. পথের লোক দয়া করে যা দেয় তাতেই চলে, প্রয়োজন হয় তো ব্রিটীশ কনসালের সংগে নিজেই দেখা করব। এখন ব্রিটীশ রাজদূতের সংগে দেখা করবার কোন দরকার আমার নাই।

লোকটি আমার কথা শুনে একটুও বিচলিত হল না। সে আমাকে বলতে লাগল, যদি আপনি ব্রিটীশ রাজদূতের বাড়ি যান তবে নিশ্চয়ই একশত পাউণ্ড পাবেন।

আমার আশ্রয়দাতা অনেকক্ষণ ইংলিশ কথা শুনে হাঁফিয়ে উঠেছিলেন আর ধৈর্য রাখতে পারলেননা। যুবকটিকে তিনি কি জিগ্গাসা করলেন এবং তারপরই আরব চা, আরব চা বলে কটি ঘুষি লাগিয়ে দিয়ে হোটেল থেকে বের করে দিলেন। এরই মধ্যে মিঃ নিকলাস এসে হাজির। তাঁকে নবাগতের কথা তো বললামই, উপরন্তু আমার আশ্রয়দাতা তুরুক যুবক যা করেছেন তাও বললাম। উভয়েই আমাকে বললেন, এসব লোক হল সিরিয়ার আরব, এদের পেশাই হল জোচ্চুরী। তার এই জোচ্চুরীর নানা কারণ আছে। এসব জোচ্চোরের মধ্যে আবার অনেক সাইপ্রাসবাসী তুরুক যুবকও আছে। এদের কথা একটু পরেই বলছি। সে-সব কথা শুনতে ভাল লাগবে না। কিন্তু আমি পর্যটক। বলে যাওয়াই আমার অভ্যাস।

আমার অর্থের অভাব। মিঃ নিকলাস বললেন, অর্থাভাব ঘুচবে আপনার আগামী কল্য। এখন চলুন ওয়াই. এম্. সি. এ -টা দেখে আসা যাক, হয়তো অনেক ইংলিশ বই পাবেন, দুএকখানা নিয়ে আসা যাবে। ব্রিজের উপর দিয়ে বড় পথটা চলেছে। ব্রিজ শেষ হওয়ার পরই পথটা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে একটা পথ চলে গেছে নিকটস্থ টিলার উপর দিয়ে সোজা আয়া সফিয়ার দিকে, অপরটি চলেছে বাদশাই মসজিদের দিকে, তার পরেরটি চলেছে ওয়াই. এম্. সি. এ -র দিকে। আমরা ধীর গতিতে চললাম ওয়াই. এম্. সি এ.-র বাড়ির দিকে, যেখানে সর্বদা ভগবানের পুত্র যীশুখৃস্টের নাম কীর্তন হয়। যদিও নিকলাস গোঁড়া খৃস্টভক্ত, তবু যখন তিনি শুনলেন যে আমি ভক্তির নামও শুনতে পারি না, তখন উপযাচক হয়ে বলতে লাগলেন, এখন হিন্দুস্থানের লোকের ধর্ম কর্ম করে সময় কাটাবার সময় নাই, এখন তাদের কাজের সময়, ধর্মকে কিছুদিন তালাক

দিয়ে কর্ম-জগতের সংগে নিকা করা দরকার। নিজেকে রক্ষা করবার শক্তি যাদের আছে, তাদেরই ভক্ত হওয়া সাজে, ভক্তি তাদেরই জন্যে। যারা নিজেকে, নিজের মা-বোনকে রক্ষা করতে পারে না, তারা ভক্তির বোঝা তো দূরের কথা, কাপুরুষতাকেই ভক্তি বলে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করে।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা ওয়াই এম্ সি এ-র দ্বারে এসে উপস্থিত হলাম। যখন নিকলাস দরজা খুলে আমাকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করবেন, এমনি সময়ে লালমুখো এক তুরুক যুবক দরজা খুলে বের হয়ে যাচ্ছিল। মিঃ নিকলাস তাকে জিগ্‌গাসা করলেন, মিঃ হামেট ঘরে আছেন? যুবক একটু রাগ দেখিয়েই বলল, হাঁ, আছেন, সেই সাইপ্রাসের গাধাটা তো? মিঃ নিকলাস আমাকে বুঝিয়ে দিলেন লালমুখো তুরুক যুবকের কথা। আমি কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ভাবতে লাগলাম সাইপ্রাসের গাধার কথা।

সেক্রেটারী দরজার কাছেই গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন। আমাদের দেখেই তিনি আমাদের আসার কারণ জিগ্‌গাসা করলেন। আমরা চেয়েছিলাম মিঃ হামেটের সংগে দেখা করতে। তৎক্ষণাৎ হামেটের কাছে লোক গেল। মিঃ হামেট এসেই নিকলাসকে এবং আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে কাফির আদেশ দিলেন। নিকলাসের মুখে আমার পরিচয় পেয়ে মিঃ হামেট খুব খুশী হলেন। আমার সংগে মিঃ হামেট সর্বপ্রথমই হরিজন প্রসংগ উত্থাপন করলেন। আমার ইচ্ছা হয়েছিল প্রসংগটা একদম চাপা দিই, কিন্তু পেরে উঠলাম না। তাঁরা দুজনেই হরিজন সম্বন্ধে কিছু বলতে আমাকে অনুরোধ করলেন। কি বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু এটা ঠিক করে নিলাম যে, যা বলব তা ঠিকই বলব, মিথ্যা বলে বিদেশীকে প্রতারণা করব না। সত্য কথা বলার দরুন মাঝে মাঝে যদিও দেশের বদনাম প্রচার হয় তবুও সত্যান্বেষীদের কাছে কিছুই গোপন করতে প্রবৃত্তি হয় না। একজন সাইপ্রাসবাসী এবং একজন গ্রীস দেশীয় লোকের কাছে আমি ভারতের কলংকের দ্বার খুলে দিলাম। তাঁরা সে কাহিনী শুনে শিউরে উঠেছিলেন, পা দিয়ে মেঝের উপর পদাঘাত করলেন আর মাঝে মাঝে বলছিলেন, মহাত্মা গান্ধী বেঁচে থাকুন। কে জানে কখন সে ব্যভিচার লোপ পাবে!

আমি তো খুলে দিলাম ভারতের দরজা, জয়চাঁদের মত বিদেশীর কাছে। না খুলেও উপায় ছিল না। যে পাপরাশি ভারতের বুকের উপর স্তূপীকৃত হয়েছে, তার উচ্চতা হিমালয়ের চূড়া হতেও উঁচু। ভারতের অন্ধেরা তা দেখছে না,

কিন্তু পৃথিবীর লোক সাগরের ওপার থেকেও তা দেখতে পাচ্ছে। যদি দেখতে না পেত তবে যেখানে আমি যাই সেইখানেই কথাটা জিগ্‌গাসা করে কেন? এখন দেখা যাক তুরুকদের দরজা আমি খুলতে পারি কি না।

মিঃ হামেটকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওয়াই. এম্. সি. এ-র কাজ কেমন চলছে? তিনি রেগে একলাফে চেয়ার হতে উঠে বললেন, ঐ যে তুরুকগুলি দেখছেন এরা কি সভ্য হয়েছে? শিখেছে শুধু কোট-পেণ্ট পরতে এবং মেয়েলোকদের ছাড়া গরুর মত ছেড়ে দিতে, যার ইচ্ছা সে-ই আপন ঘরে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর এই এত বড় প্রতিষ্ঠান, যার পৃথিবী জুড়ে ব্রান্‌চ্ রয়েছে, তারা এর ধ্বংসেরই কামনা করে। কোন দিন একটা চেয়ার, কোন দিন বা একটা টেবিল ভেংগে দিয়ে যাচ্ছে, চাঁদা চাইলে চোখ রাংগিয়ে ওঠে, যেন গোঁয়ার গুণ্ডার মুলুক। আমরা কজন সাইপ্রাস-বাসীই এই এত বড় প্রতিষ্ঠানটির প্রাণ বাঁচিয়ে রেখেছি। যদিও আমি মুসলমান ধর্মাবলম্বী তবুও এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান যাতে বেঁচে থাকে, তার চেষ্টা করা কি আমার উচিত নয়? নিশ্চয়ই আপনাদের দেশেও শত সহস্র ওয়াই. এম্. সি. এ. আছে, যার দ্বারা অনেক সংকর্ম সাধন হয়। কিন্তু ঐ তুরুকগুলি ধর্মের নাম শুনলেই ক্ষেপে যায়; শুধু জানে ইন্‌জিনিয়ারিং, জার্মান ভাষা আর আতা তুরুক।

মিঃ নিকলাস অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলেন। ইত্যবসরে যে তাঁর মুখের রং পরিবর্তিত হচ্ছিল তা আমি লক্ষ্য করছিলাম। তিনি আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। লালমুখো লোক যখন রাগে, তখন তাদের মুখ হয় সাদা। মিঃ নিকলাসের মুখও অনেকটা সাদা হয়ে উঠেছিল। তিনি মিঃ হামেটকে আর বেশি অগ্রসর হতে না দিয়ে বললেন, ওসব কথার জন্য তাঁকে জবাব দিতে হবে। মিঃ হামেট তাঁর কথার গুরুত্ব অনুভব করে থতমত খেয়ে গেলেন। তারপর নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়ে বললেন, ভয়ের কোন কারণ নাই ইস্‌লামের জন্য প্রাণ দিতেও রাজী, জেনে নেবেন মিঃ নিকলাস।

মিঃ নিকলাস বললেন, আপনি তুর্কীর মহিলাদের যেরূপভাবে আক্রমণ করে কথা বললেন তা কোন ভদ্রলোক সহ্য করবে না। সুলতানের রাজত্বের যখন পূর্ণ বিকাশ ছিল, ইসলামের পতাকা যখন উচ্চাকাশে পত পত করত, তখন বারবনিতার প্রাচুর্য ছিল এই নগরীর বুকের উপর; তারা

পথিককে পর্য্যন্ত আক্রমণ করত। এখন সেখানে একটিও বারবনিতা নাই। শুধু তা বললে হবে না, প্রত্যেক নারী এখন শিখেছে তার আত্মমর্যাদা। আমি গ্রীক, আমার সংগে তুরুক জাতের চিরকালের শত্রুতা। তা বলে, যার সংগে শত্রুতা করব, তাকে আমরা অমানুষ দেখতে চাই না। ঐ তো সেদিনের কথা বলছি, যখন স্থলতান গদিতে ছিলেন তখন আমাদের মত ছোট প্রাণীকেও বিচারালয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা তুরুকদের ছিল না। আমরা অনেক তুরুক ছেলেকে বেশ দু ঘা লাগিয়ে দিয়ে ঘরে চলে আসতাম, আর তুরুক পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকত আমাদের কনসালের দরজায় শমন নিয়ে। কনসালের ইচ্ছা হলে শমন জারী করতে আদেশ দিতেন, নতুবা নয়। আর এখন আমরা কি আরামে আছি! আমাদের প্রতিপত্তি আধিপত্য সবই লোপ পেয়েছে। তবুও আমরা স্থখী, একটা রুগ্ন শরীরে নব রক্তের সন্চার দেখে। আজ আমরা আনন্দিত যে নতুন তুর্কীর নতুন যুবক-যুবতী কর্মের স্বাদ এবং স্বাধীনতার সন্ধান পেয়ে মরণের পথ থেকে ফিরে এসেছে। গাত্রদাহ যদি কারও হয়, তবে হবে আমাদের, বুলগেরিয়ানদের, রুমানিয়ানদের—আপনার নয়। আপনি সাইপ্রাসে থাকেন, একদিন তুরুকই ছিলেন, কিন্তু কর্মদোষে অকর্মণ্য হয়েছেন। মনে রাখবেন, আর কোন দিন যেন প্রকাশ্যে তুর্কীর নারী সম্বন্ধে যা তা মন্তব্য করবেন না। ওরা যদিও অনেকটা এগিয়ে আসছে, তবুও ওদের উন্নতি অন্যান্যদের মত হয় নি। তুর্কীর মেয়েরা যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে, তখন দেখবেন একের স্থলে শত আতা তুরুক এই তুর্কীতে বিদ্যমান। এখন তুরুক ভীত, নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টায় রত। তখন দেখবেন, সে আপনিও বাঁচবে, অপরকেও বাঁচাবে।

মিঃ নিকলাস এবং মিঃ হামেটের মধ্যে বেশ কথা-কাটাকাটি চলছিল। মিঃ হামেট বলেছিলেন, সেণ্ট সফিয়াকে মিউজিয়মে পরিণত করা আতা তুরুকের অন্যায় হয়েছে। মিঃ নিকলাস বললেন, পূর্বেই আপনি বলেছেন, ধর্মের জন্য আপনি প্রাণ দিতে প্রস্তুত, কিন্তু কই এ ক্ষেত্রে তো প্রাণও দেন নি, স্বর্গেও যান নি।

মিঃ নিকলাস এবং মিঃ হামেটের মধ্যে এর পর যে-কথা হয়েছিল, তাতে বুঝতে পেরেছিলাম, আতা তুরুক সেণ্ট সফিয়াকে মিউজিয়মে পরিণত করে তুরুক জাতকে ভবিষ্যত বিপদ হতে রক্ষা করেছেন। তুর্কীর স্বাধীনতা

কি করে তখনও বজায় ছিল, অনেক ধর্মান্ধ তা বুঝতে পারে না। ইউরোপের বড় বড় যে কোন শক্তি তুর্কীর স্বাধীনতা হরণ করে তুর্কীকে পরাধীন রাজ্যে পরিণত করতে পারত। কিন্তু ভাগ-বাঁটোয়ারায় বিঘ্ন আছে বলেই তুর্কীকে ইউরোপের শক্তিশালী দেশগুলি আক্রমণ করে নি। বুলগেরিয়া, গ্রীস এবং রুমানিয়ার ক্যাথলিক ধর্ম-যাজকগণ যখন সেণ্ট সফিয়া নিয়ে ঘরোয়া বৈঠক বসিয়ে তুর্কীকে জাহান্নমে পাঠাবার বন্দোবস্ত করলে, তখন আতা তুরুক তার কিছুটা বুঝতে পেরেই সেণ্ট সফিয়াকে মিউজিয়মে পরিণত করে দিলেন। যারা আধ পাউণ্ড, এক পাউণ্ড উৎকোচ পেয়ে মত বদলায়, তারা অপরের অনিষ্ট সাধন করতে বেশ পটু একথা সকলেই জানে, কিন্তু উপকার করতে পারে না। তারা জাতের বিপদের সময় পালায়। আতা তুরুক সেই জাতীয় লোকের মুখ বন্ধ করে দিলেন, একটা ঘরেতে সর্বসাধারণের প্রবেশের অধিকার প্রদান করে। অবশ্য সেজন্য যে-সকল মুসলিম পুরোহিত ক্ষেপে উঠেছিল, তাদেরও আতা তুরুক সায়েস্তা করেছিলেন।

মিঃ হামেটের মন যেন অশান্তিতে ভরে উঠেছিল। তিনি তুরুক জাতকে ছেড়ে দিয়ে গ্রীকদের লক্ষ্য করে নানা কথা বলতে লাগলেন। মিঃ নিকলাসও চুপ করে বসেছিলেন না, তিনিও জবাব দিয়ে যাচ্ছিলেন। মিঃ নিকলাস বলছিলেন, আমাদের মধ্যে দুর্বলতা এসেছিল, আমরা তুরুকের পদানত হয়েছিলাম, কিন্তু এখন আমরা মুক্ত হয়েছি। সাইপ্রাসবাসীরা বিদেশে বড় বড় গাধা বিক্রয়ার্থ পাঠায়, আমরা গাধা বিদেশে না পাঠিয়ে, মাঝে মাঝে স্মার্না নগরীতেও হানা দেই। যখনই দেখি আতা তুরুকের মত লোক অপরের লাঠির উপর নির্ভর করে আমাদের তাড়াতে আসেন, তখন আমরা চলে আসি। এরূপ আসা যাওয়ায় কি কাজ হয় নি? যদি আমরা এরূপ আসা যাওয়া না করতাম তবে আজ ইউরোপীয় শক্তিরা তুর্কীকে স্বাধীন বলে স্বীকার করত না। ওদের কথার এখানেই সমাপ্তি হল।

তিন জন মিলে পথে বের হয়ে পড়লাম। সূর্য্য অস্ত গেছে। আশে-পাশের মসজিদ হতে তান্দ্রে উলুতুর রব আকাশে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল কিন্তু সেই ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনির দিকে জনসমাজ কেউ যেন কানই দিচ্ছে না। কাফে ও রেস্তোরাঁ লোকে লোকারণ্য। সকলেই আনন্দে মত্ত। ভগবানের অস্তিত্বের কথা, ভগবানের কাছে দিনান্তের ভক্তি নিবেদনের কথা কেউ

ভাবছে না। সবাই যেন তান্দ্রে উলুতুর ধ্বনিকে খাবারের দোকানে, নাচ-ঘরে, মদের দোকানে বসে উপহাস করছে। মিঃ হামেট এই বিষয়টি লক্ষ্য করে বললেন, এতে তুরুক জাত কি জাহান্নামে যাবে না? আমরা তাঁর সেই মন্তব্যে কান দিলাম না, কারণ পথে দাঁড়িয়ে মতবাদ নিয়ে তর্ক করা কেউ পছন্দ করে না। আমরা কএকটি মসজিদেরই দ্বারে গিয়ে দেখলাম যে সেখানে মুষ্টিমেয় লোক নামাজ পড়ছে। মসজিদে গিয়ে সময় অতিবাহিত না করে, তরুণ তুর্কীর নবজীবন-ধারা দেখতে আমরা চেষ্টা করলাম।

পথে একজনও ফকির বা ভিখারীর সংগে দেখা হল না। তবে এরা গেল কোথায়? যখন সুলতান রাজত্ব করতেন তখন ফকিরের দল ছিল, ভিখারীর দল ছিল, অন্ধের দল ছিল, খন্‌জের দল ছিল। তাদের অর্থ, খাদ্য, বস্ত্র দান করে লোকে স্বর্গে যাবার পথ পরিষ্কার করত। স্তাম্বুল ছিল দানগ্রহণকারীদের আড্ডা, কিন্তু আজ এরা কোথায়? এদের কি মেরে ফেলা হয়েছে? না, এদের মেরে ফেলা হয় নি। এদের থাকবার ঘর করে দেওয়া হয়েছে, খাবারের বন্দোবস্ত করা হয়েছে, কর্মক্ষমদের কাজে লাগানো হয়েছে। দান নেবার এবং দান করবার কোন দরকার নাই। এবার ধনীদের স্বর্গে যাবার পথ বন্ধ হল। সেবাইতদের জীবে দয়া করা বন্ধ হল। স্তাম্বুল নগরী স্বর্গ কি নরকে পরিণত হল তা বলবার আমার অধিকার নাই তবে যা দেখেছি তাই লেখনীর সাহায্যে দেশবাসীকে উপহার দিচ্ছি। উপহার গ্রহণ করা না করা দেশবাসীর ইচ্ছা।

অনেকক্ষণ বেড়াবার পর আমিই জিগ্‌গাসা করলাম, মিঃ হামেট, বলতে পারেন এখানকার গুণ্ডা বদমায়েস এবং অন্যান্য সমাজদ্রোহীরা কোথায় বাস করে? মিঃ হামেট বললেন, এসব আর নেই, জার্মানীতে যেমন প্রবলপ্রতাপান্বিত গুপ্ত পুলিশ আছে, এখানেও তাই। এই পুলিশের হাত হতে এরূপ লোক কোনরূপেই রক্ষা পেতে পারে না। এই সেদিনই একটা কদর্য ক্লাব ভেংগে দেওয়া হয়েছে।

মিঃ নিকলাস কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময়ে মিঃ হামেট বললেন, রাজতন্ত্রী দেশ এসবের প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। আপনিও বোধ হয় এসবের পক্ষপাতী, মিঃ নিকলাস? মিঃ হামেটের পরিচিত লোক বলেই একথাটা তিনি তাঁকে বলতে পেরেছিলেন।

ঝগড়া যাতে আর না বাড়ে সেজন্য আমি বললাম, আগামী কল্য আমি সেণ্ট সফিয়া দেখতে যাব। আপনারা কেউ যাবেন? কেউ যেতে রাজী হলেন না। উভয়েই বললেন, আপনি একা গিয়ে প্রথম দেখে আস্থন, তারপর আমাদের বলুন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানটি সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা। বিষয়টা চাপা পড়ে গেল। মিঃ হামেট বললেন, আগামী রবিবারে আপনাকে একটা স্থানে নিয়ে যাব। সেখানে দেখবেন বীভৎস দৃশ্য—যা এ জীবনে কখনও দেখেন নি। মিঃ নিকলাস বাধা দিয়ে বললেন, পর্যটক আগামী রবিবার সারা দিন ভিক্ষা করবেন, তার বন্দোবস্ত আমি করব। যদি তাঁর স্তাম্বুল থাকার সমুদয় খরচ দেন তবে তাঁকে ঐ তথাকথিত বীভৎস দৃশ্য দেখাতে নিয়ে যেতে পারেন। আমার বীভৎস দৃশ্য দেখতে যাওয়া হয় নি। সমুদয় রবিবারটা ভিক্ষা করেই কাটাতে হয়েছিল।

ভিক্ষা করা ঘৃণ্য কাজ। ইউরোপে যখন ভ্রমণ করছিলাম, তখন এক রকমের লোকের সংগে প্রায়ই দেখা হত। কোথায় গিয়েছিলেন জিগগাসা করলেই তারা বলত—কাজে গিয়েছিলাম। এখানে কাজ মানেই হল বেনামী ভিক্ষা। এতে তারা লজ্জিত হত না। একদিন তাদের একজনকে জিগ্‌গাসা করেছিলাম, এরূপ প্রবন্‌চনাপূর্ণ ভিক্ষাবৃত্তি কি মনের অবনতি ঘটায় না? কিন্তু প্রশ্নের যা উত্তর পেয়েছিলাম, তাতে স্তম্ভিত হয়েছিলাম। জবাব পেয়েছিলাম, কার কাছে ভিক্ষা করছি? যারা ছলে বলে কৌশলে আমাদেরই অর্থ আপন করে আপনার ব্যাংকে তুলে রেখেছে, তাদের কাছেই তো? এতে লজ্জা কিসের?

শুক্রবার সকল অফিস খোলা থাকবে, কাজকর্ম মোটেই বন্ধ করা হবে না, এই হচ্ছে সর্বসাধারণের প্রতি আদেশ। একথাটা আমাকে কেউ বলে নি, এমন কি মিঃ নিকলাসও না। রাত্রি প্রভাত হবার পর অতি প্রত্যূষে মিঃ নিকলাস আমাকে নিয়ে খাবার খেতে বের হলেন। খেতে বসে উভয়ে অনেক গল্প গুজব করে সময় কাটিয়ে বেলা দশটার সময় একটা ছাপাখানায় গিয়ে কার্ডগুলি ছাপাতে দিলাম। ছাপাখানার মালিক মিঃ নিকলাসকে বার বার বলে দিলেন, যদি শনিবার বারটার পূর্বে কার্ড নিয়ে না যান তবে সোমবার ছাড়া কার্ড আর পাবেন না। বুঝলাম শুক্রবার কাজ করা হচ্ছে এবং রবিবারে কাজ হবে না।

কিন্তু আজ প্রার্থনার দিনে লোক কাজ করছে কেন? এদের ধর্মের আগ্রহ

কি লোপ পেয়ে গেছে? আমি এ সম্বন্ধে মিঃ নিকলাসকে কোন প্রশ্নই করি নি। দ্বিপ্রহরে আবার একটা রেস্তোরাঁয় খেয়ে নগর ভ্রমণে বের হয়ে পড়লাম। কোথাও কোনরূপ ডিমন্স্ট্রেসন নাই। বৃহস্পতিবারে যেমন কাজ চলছিল আজও তেমনি চলছে। শুক্রবারে আমাদের দেশের লোক নামাজ পড়বার জন্য যেমন কতক্ষণের জন্য ছুটি পায়, স্তাম্বুলে তা-ও কেউ পেল না, অথচ ধর্মের জন্য কেউ বিদ্রোহও করল না, বড়ই আশ্চর্যের বিষয়।

তুরুক জাত একদা ইস্লাম ধর্মের রক্ষক ছিল। তারা খৃষ্টানদের দ্বারা বার বার আক্রান্ত হয়েও ইস্লাম ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখছিল। আজ সেই তুরুক জাত শুক্রবারে কাজ করতে কোনরূপ ওজর করছে না। এর মূল কারণ কি? অর্থনীতিই হল তার মূল কারণ। তুরুক মজুর এখন রোজ মাইনে পায়, তাদের ছেলেপিলের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার্থে তুরুক সরকার প্রাণপণ করছেন, তা মজুররা মর্মে মর্মে অনুভব করছে। সেপাইদের খাওয়া-পরা, শিক্ষা, তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সুখ-সুবিধা, সবই তো তুরুক সরকার দেখছেন, তাদের মধ্যে বিদ্রোহ আসবে কেন? যে সকল দরিদ্র দিনান্তে একবার খেত, তারা আজ পেট বোঝাই করে খাচ্ছে। যে সকল অন্ধ অর্থাভাবে পথে বেড়াত, মাসে বোধ হয় একদিন ভাল করে খেতে পেত না, তারা আরামে সুখ-শয্যায় ঘুমুচ্ছে। যে সকল পংগু লোক হা অন্ন হা অন্ন করে পাথর ভাংত নিজের মাথায়, তাদের মাথায় এখন সুন্দর ইউরোপীয়ান টুপি এবং তৎসংগে তাদের দরকারী যত কিছু সব। কে এমন অবস্থায় এমন সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করবে? হাঁ, করবার লোক ছিল, যারা পরের শ্রমে নিজের পেট পূর্ণ করত। তারা অনেকে এখন স্বর্গে গিয়ে কায়েমী স্থানে বাস করছে। যারা জীবিত আছে, তারা সৎপথে অর্থ উপার্জন করে সুখেই আছে। প্রতিবাদ করবার মত কেউ নাই সেইজন্যই শুক্রবারকে শুক্রবার বলে আর মনে হয় না, কাজের বার রূপেই দেখতে পেয়েছিলাম।

এই সেণ্ট সফিয়া, যার অপর নাম আয়া সফিয়া, যাকে মসজিদরূপে দেখে খৃস্টানের মনে ঝন্ঝা বয়ে যেত আর মুসলমানের মনে প্রীতির সন্চার হত। যেখানে পূর্বে শুধু মুসলমানই যেতে পারত, আর সকলে বাইরে দাঁড়িয়ে বাইরের দৃশ্যাবলী দেখেই মুসলমান ধর্মের বিরুদ্ধে একটা বিকট ধারণা নিয়ে যেত, যেখানে লম্বাদাড়ি মোল্লাগণ বুক ফুলিয়ে আল্লার নাম করতেন, আর আড়-

নজরে দর্শকদের দিকে চাইতেন, সেখানে গিয়ে আমি হাজির। সেখানে দুজন ভারতীয় দোভাষীর সংগে দেখা হল। তাঁরা স্তাম্বুলে অনেক পূর্বে এসেছিলেন, এখনও তাঁদের মন হতে হিন্দুস্থানের স্মৃতি লোপ পায় নি। আমাকে পেয়ে তাঁদের দেশের কথা মনে হল, আলিংগন করে তাঁরা সেণ্ট সফিয়ার বাইরে আমাকে বসালেন। তারপর আমার পরিচয় পেয়ে প্রবেশ মূল্য যাতে না লাগে তার বন্দোবস্ত করে সেণ্ট সফিয়ার ভেতরে আমাকে নিয়ে গিয়ে নানারূপ দৃশ্যাবলী দেখাতে লাগলেন। সেণ্ট সফিয়ার ভিতর দিক দেখে মনে হল নানা কথা। গির্জাকে মসজিদে পরিবর্তিত করতে ওরা বেশী পরিশ্রম করেন নি। শুধু যেদিকে মক্কা সেদিকে একটা বেদী গড়েছেন মাত্র। যেখানে বাইবেলের কথামৃত লেখা ছিল, তা উঠিয়ে সেখানে কোরান হতে নানা কথা লেখা হয়েছে, এর বেশী আর কিছুই নয়। কিন্তু আজ মসজিদে নানা ধর্মের লোক বেড়াচ্ছে, আর ভাবছে, যে সকল ধর্ম পৃথিবীতে শান্তির জন্য সর্বদা চেষ্টা করেছে, তাদের দুটোতে যখন সংঘর্ষ হয়, তখন তার ফল কি হয়? মুসলিম এবং খৃস্ট ধর্মের সংঘর্ষে গির্জার পরিণতি হয়েছে মসজিদে। মানুষের উপর এতে কি কোন পরিবর্তন এনেছে, তা কি সকলে প্রণিধান করে দেখে? যারা বাড়িটারই শুধু অদল বদল করল সে চোখ তাদের ছিল না, কিন্তু বর্তমানে এসব কিছু প্রণিধান করার দরকার হয় না। বর্তমানে লোকে দেখছে, গির্জাকে মুসলমানরা মসজিদ করে জাহান্নমে যায় নি, বরং যখন সেই কাজটি হয়েছিল তখন মুসলিম ধর্মের প্রচার দ্রুত হচ্ছিল। আজ মসজিদকে মিউজিয়ম করে তুরুক জাত জাহান্নমে যায় নি, বরং এখন তুরুক জাত পৃথিবীর একটি বিশিষ্ট জাতে পরিণত হয়েছে।

সর্বশেষে দেখলাম তখনকার দিনের আঁকা একখানা ছবি সেণ্ট সফিয়ার দরজার উপরে অংকিত রয়েছে। সেই ছবিখানা যীশু খৃস্টের মরণের শত বৎসর পর আঁকা হয়েছিল, এ কথা গাইডের মুখেই শুনলাম। যখন মুসলমান ধর্মের প্রবল প্রতাপ, খৃস্টানগণ যখন দেখল আর এ গির্জ্জা রক্ষা করা চলবে না, তখন তারা ছবিটাকে কি এক কৌশল করে ঢেকে রাখে। আমেরিকান ঐতিহাসিক পুরাতন বই খুঁজে তার অবস্থিতি ঠিক করে বের করেছেন। কিন্তু সাধারণ লোকের কাছে এখন আর সেই ছবির কোন মূল্য নাই।

যারা খৃস্ট ধর্মের ভক্ত, তারাই ভারতীয় প্রথা মতে মাটিতে পড়ে কেউ ছবির অথবা কারও উদ্দেশ্যে নমস্কার জানাচ্ছে। সেই নমস্কারের পদ্ধতি দেখে কেউ হাসছে, কেউ অবগ্ণা করছে, কেউ বলছে মানব হলেও ওদের মধ্যে মানবত্ব ফুটে ওঠে নি। আজ সেণ্ট সফিয়া দেখে আমার তন্দ্রা ভাংল। সেণ্ট সফিয়াকে অনেকক্ষণ দেখে মনে হল, এসব ভাবোন্মত্ততা মাত্র। মানব-সমাজ এগিয়ে যাচ্ছে। তারা পাথরকে পাথর বলেই বুঝতে পেরেছে, নতুবা সেণ্ট সফিয়া আজ মিউজিয়ম হয় কিসে? দেশীয় ভাইদের ধন্যবাদ দিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। মিঃ হামেট এবং মিঃ নিকলাস আমার অপেক্ষায় বসে ছিলেন। ধর্ম ও ভক্তি সম্বন্ধে তাদের আমার মনোভাব জানাতেই তাঁরা উভয়ে হেসে বললেন, দুনিয়া এগিয়ে যাবেই, কেউ তাকে ধরে রাখতে পারবে না।

রবিবার আসছে। আজকের রবিবারের বিশেষত্ব হল গত রবিবারেও লোকে কাজ করেছে। তাই আজকের রবিবারে কাজ করতে হবে না। ইউরোপের লোক কিসের জন্য রবিবারে কাজ করে না, সে সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত আছে। কিন্তু তুর্কীতে রবিবারে কাজ করা হবে না তার একমাত্র কারণ হল, পৃথিবীর লোকের এক সংগে পা ফেলে চলতে হবে। আজ সকলেই প্রাতে নানারূপ সাজগোজ করে বেরিয়েছে। এরই মধ্যে অনেকে কাবেরেতে গিয়ে নাচ শুরু করেছে। কাফে, রেস্তোরাঁ লোকে ভরতি হয়ে গেছে। পথঘাটে কোথাও লোক নাই। মাঝে মাঝে দু একজন পুলিশ দোকানের তালা ঠিক বন্ধ আছে কিনা, তাই টেনে দেখছে।

মিঃ নিকলাস এবং আমি, আমার ভিক্ষার পরওয়ানা নিয়ে বেলা দশটার সময় বের হলাম। পথের দুদিকে যত কাফে আছে, তাদের প্রায় প্রত্যেকটিতেই আমরা কার্ড বিতরণ করলাম। কোন কাফে হতে দু লিরার কম পাই নি। বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্বেই আমার হাতে তুর্কীর চল্লিশ পাউণ্ড হয়ে গেল। মিঃ নিকলাসের ঋণ সর্বপ্রথম পরিশোধ করলাম, তারপর উভয়ে মিলে বেশ ভাল দেখে একটা রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করে দই পায়েস ভাত দুম্বার কাবাব ও মুরগীর তরকারীর আদেশ দিলাম। দুজনে মিলে বেশ করে খেয়ে নিয়ে আরাম করে কাফি খেতে লাগলাম। আমাদের দেশে মিষ্টান্ন কোথাও কিনতে পাওয়া যায় না। তুর্কীতে এতদিন অর্থাভাবে মিষ্টান্ন খেতে পারি নি, আজ সুযোগ হয়েছে। মিষ্টান্ন খেয়ে দেখলাম, মিষ্টান্নের পাকপ্রণালী উভয় দেশেই এক প্রকার।

আমাদের দেশে মিষ্টান্ন খেতে আবার ছুৎমার্গের ভয় আছে। তাই মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে মিষ্টান্ন পাওয়া যায় না।

বিকালেও আবার অনেক কাফেতে গিয়েছিলাম। বিকালে আরও তিরিশ লিরা হয়েছিল। মিঃ নিকলাসকে বললাম, অর্থের আর দরকার নাই, এবার স্তাম্বুল দেখাতেই সময় কাটাতে হবে; কিন্তু মিঃ নিকলাস ছাড়বার পাত্র নন। তিনি বললেন, ব্রিটিশ কনসাল এবং অন্যান্য ব্রিটিশ অফিসারদের সংগে আপনার দেখা করা উচিত। মিঃ নিকলাসের কথামত কনসাল এবং অন্যান্য অফিসারদের সংগে সাক্ষাৎ করেছিলাম। তাঁরা আমাকে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন।

স্তাম্বুল নগরীর অতি প্রাচীন একটি বৃহৎ সরাইএর বর্তমান অবস্থা দেখে সত্যই বিস্মিত হলাম। ইহা দিন দিনই যেন পাতালে প্রবেশ করছে। সেই সুযোগে প্রত্যেকটি রুমে সমুদ্রের জল প্রবেশ করে এক একটি জল-কুণ্ড গড়ে উঠেছে। এক কুণ্ড হতে অন্য কুণ্ডে যাবার পথও আছে। সরাইএর দরজাই সেই সকল পথ। পূর্বে এই সরাইএ শুধু যুবকগণই গিয়ে লুকোচুরি খেলত, বর্তমানে তার পরিবর্তে একজন যুবক এবং একজন যুবতী একটি ডিংগি ভাড়া করে সেখানে জলবিহার করে। সাইপ্রাসবাসী তুরুক যুবক তা সহ্য করতে না পেরে এক তুর্রুক রমণীর উপর কাদা ছুঁড়ে মেরেছিল। প্রতিবাদে না ঈর্ষ্যায় বুঝে উঠতে পারি নি।

আমি সেখানে গিয়ে আনন্দই পেয়েছিলাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রকৃতির পুত্রকন্যারা স্বাভাবিক ভাবেই উপভোগ করছে। কিন্তু স্থানটা দেখে আমার মনে কি একটা ধাঁধা লেগে গেল। চুনা পাথর কেমন সুন্দর করে অর্ধ পথ সরাইটিকে ধরে রেখেছে। একটু পরীক্ষা করে দেখলাম, যদি কএক বছরের মধ্যে চুনা পাথরের প্রস্রবণ উপরের দিকে না উঠতে থাকে, তবে ঐ সরাইএর হয়তো অন্তর্ধান হবে। তুর্কীতে হয়ত ভুমিকম্প আরম্ভ হবে, ফিরে এসে দেখলাম অনেকগুলি নারী হাত দেখাতে বসে আছেন।

তুর্কীতে হাত দেখানো আইনসংগত নয়। কিন্তু আইনের নিষেধ সত্ত্বেও হস্তরেখা দেখিয়ে যারা সুখী হতে চায়, তাদের প্রত্যেককে জিগ্‌গাসা করলাম, তাদের অর্থাভাব আছে কি না? কারও অর্থাভাব নাই, কেউ রাজা হতে চায় না। তারা এসেছে নিজের ইচ্ছামত স্বামী পাবে কি না তার সংবাদ নিতে।

যেখানে অর্থের কোন মূল্য নাই, সেখানে যাদুবিদ্যার সাহায্য নেওয়া স্বাভাবিক। ভেবে দেখলাম, যাদুবিদ্যা যেন পৃথিবী হতে বিদায় নিতে চায় না। যুবতীদের বললাম, হাত দেখিয়ে কোন লাভ নাই, যাদুবিদ্যার মূল্য, ভূতের মাদুলীর মূল্য ফকিরদের সংগে চলে গেছে, এখন আপনারা আপনাদের বুদ্ধিবলে আপন আপন প্রাপ্য পাবার জন্য চেষ্টা করুন। এদেশের এবং যে কোন পাশ্চাত্য দেশের লোকের ধারণা, হিন্দুস্থানের প্রত্যেক হিন্দুই হস্তরেখা দেখার চর্চা করে থাকে। সামুদ্রিক বিদ্যায় আমার আস্থা নাই, এটা তাদের কাছে বড়ই আশ্চর্যের কথা। যুবতীদের বুঝিয়ে দিলাম, সময়ের পরিবর্তন হয়েছে এখন আমরা বাজে সময় নিয়ে আর সময় কাটাই না। যখন আমি স্ত্রীলোকদের সঙ্গে কথা বলছিলাম তখন সাদা পোশাকে দুজন পুলিশ বসেছিল। তারা উঠে এসে আমার করমর্দন করল। দোভাষী মিঃ নিকলাসের দ্বারা বুঝিয়ে দিলে, যদি আজ আমি ওদের হাত দেখতাম এবং টাকা আদায় করতাম তবে কএক মাস আমাকে এদেশের জেলে বাস করতে হত। আমি কাফে ও রেস্তোরাঁতে গিয়ে পরোক্ষভাবে ভিক্ষা করেছি, তা তারা দেখেছে, কিন্তু সেজন্য তারা মোটেই দুঃখিত হয় নি।

সিনেমা, থিয়েটার, অপেরা অনেক দেখলাম। প্রত্যেকটি স্থানেই আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়ে শিক্ষাবিস্তার হচ্ছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নিজেদের প্রাক্তন দুরবস্থা এবং অন্যান্য দেশের সুব্যবস্থা এতদুভয়ের তুলনামূলক আলোচনা হচ্ছে। প্রত্যেক দিনই তুরুকরা উন্নতির দিকে এক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছে। পুরাতন আইন-কানুনকে সকলেই অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতে শিখছে।

স্তাম্বুলে একটা মিউজিয়ম দেখলাম। তাতে আছে পুরাতন আমলের রণসম্ভার এবং বর্তমান সময়ের রণসম্ভারও রাখা হয়েছে। দর্শককে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে, পুরাতন অস্ত্রের এই ক্ষমতা, আর নূতন অস্ত্রের এই শক্তি। পুরাতন সেপাই এই করতে পারত, বর্তমানের সেপাই এই করতে পারে। মিউজিয়মে চিকিৎসা-সংক্রান্ত দ্রষ্টব্যও প্রচুর ছিল এবং থাকা উচিতও।

স্তাম্বুল নগরীতে বড় বড় ইমারত, মসজিদ, প্যালেস অনেক ছিল, কিছুই দেখতে ইচ্ছা হল না। নিকলাস, হামেট ইত্যাদি বন্ধুগণের অনুরোধ সত্বেও আমার মনে উৎসাহের সন্চার হয় নি। এসব স্থানে কারুকার্য থাকতে পারে, কিন্তু তার মূল্য আমার কাছে কিছুই নয়। যার গড়ন হয়েছে নির্যাতনের দ্বারা তার সৌন্দর্য্য থাকতে পারে না। বেনারসের এক পাদরী বলেছিলেন, বেনারসের

গির্জা হয়েছে চুণ সুরকীর সংগে জল মিশিয়ে রক্ত মিশিয়ে হয় নি। যদিও কথাটার অন্য অর্থ ছিল, তবুও সে কথাটাকেই ভিত্তি করে বলতে পারি, রক্ত সিন্চনে যার গড়ন, অনল বর্ষণে তার ধ্বংস হবেই, তাকে দেখে লাভ কি? ডুনিয়া এগিয়ে চলছে, এখন চিনতে পেরেছে অনল কোথায়, আর জল কোথায়।

স্তাম্বুল হল ইউরোপের একটি বিশিষ্ট নগরী। প্যারী, লণ্ডন, অথবা টানজিয়র্স নগরের সংগে এই নগরীর তুলনা করা যেতে পারে। আয়তনের অথবা সমৃদ্ধির কথা মোটেই বলা হচ্ছে না। ইউরোপের এবং আফ্রিকার এই ক'টি নগরীতেই রাষ্ট্রনৈতিক প্রগতিপন্থীরা এসে আড্ডা গাড়তে সুবিধা পেয়ে থাকেন। অন্যত্র তাঁরা এমন সুবিধা পান না। স্তাম্বুলেও সেরূপ সুবিধা পাবার উপায় ছিল, কিন্তু নানা কারণে সে সুবিধা এখন আর পাওয়া সম্ভব নয়। পূর্বে ইউরোপ থেকে অনেক গণ্যমান্য লোক এ শহরে পালিয়ে এসে আত্মগোপন করতেন। বর্তমানে প্রগতিশীলদের প্রকাশ্যে স্থান দেওয়া হয়, এতে তুর্কীর লোকের জাগরণই হয়, পেছনে ফিরে যাবার কথাই ওঠে না। প্রগতিশীল দুএকটি আড্ডায় গিয়ে সময় কাটিয়েছিলাম বটে, কিন্তু তাঁদের কথা প্রথমত বুঝতে পারতাম না। দ্বিতীয় কথা হল, মিঃ নিকলাস রাজতন্ত্রী বলে তাঁদের সকল কথা আমাকে বুঝিয়ে দিতেন না। ইউরোপ আজ নানারূপে রাষ্ট্রমত নিয়েই ব্যস্ত, ধর্মতত্ত্বের সংবাদ নেবার সময় আর ওদের নাই।

আর এক রবিবার এল। আজ আমরাও বিশ্রাম করছি। আমাদের আর অভাব নাই। মনে একদিকে যেমন আনন্দ, অন্যদিকে তেমনি নিরানন্দ। স্তাম্বুল নগরী ছেড়ে চলে যেতে হবে। পথ আবার আমাকে ডেকে বলছে, এ সুখ তোমার জন্য নয়। তোমাকে আমার কাছে আসতে হবে। পথ, তোমাকে ভালবাসি, কিন্তু যখন হাতে টাকা আসে, শহরের সৌন্দর্য তখন আমার নয়নে অন্য ভাবে এসে দেখা দেয়। দুঃখ তখন সরে দাঁড়ায়, সংগে সংগে আমার মধ্যের মানবতা কোথায় চলে যায় বলতে পারি না। তখন ঘৃণা অহংকার অভিমান এসে দেখা দেয়।

স্তাম্বুল নগরীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আমরা দলবদ্ধ হয়ে বেড়িয়ে এলাম। আজ আমার সংগে বেড়াতে বেরিয়েছেন একজন রুমানিয়ান। যখন অর্থের অভাব হয়, তিনি তখন জুতো সেলাই করেন। একজন জার্মান—তিনি জু নন—তিনি জার্মান জাতের হয়ে জার্মানদ্রোহী, তাঁর যখন অভাব হয় তখন

তিনি দরজির কাজ করেন। অন্যজন আইরিশ, তিনি পাশেই কোথাও চাষের কাজ করেন। রাজতন্ত্রী হয়েও মিঃ নিকলাস এদের সংগে চলতে কোনরূপ দ্বিধা অনুভব করেন নি।

আমরা পুরাতন স্তাম্বুলে গিয়ে পড়লাম। পুরাতন স্তাম্বুল দেখে দিল্লীর হস্তিনাপুরের কথা মনে পড়ল। কএকখানা ইট এবং পাথর হাতে নিয়ে তার গড়ন দেখলাম। মাটি হতে পাথর হয়েছে। যার গড়ন দেখলে আমার মনে আনন্দ হয়, তাই নিয়ে খেলতে ইচ্ছা করে। কিন্তু যারা বাস্তবের কথা ভাবেন, তারা এ সবকে পরিত্যাগ করে সর্বপ্রথমই গড়নের দিকে মন দেন। আমার প্রত্যেক সংগীরই গড়নের দিকে মন, পুরাতনকে যেন এরা উপহাস করেই যাচ্ছেন।

পুরাতন স্তাম্বুলের সংগে পুরাতন গ্রীক ইতিহাসের সম্বন্ধ আছে। মিঃ নিকলাস যখন মাথা নত করে তারই দেশের পুরাতন গৌরব দেখছিলেন, আমিই তাকে বললাম, পুরাতন ভুলে যান মশায়, নূতন জিনিস দেখুন, তাতে শান্তি পাবেন। নিকলাস হাসলেন, কিছুই বললেন না। আমরা সেদিনকার মত ভ্রমণ সমাপ্ত করে ঘরে ফিরে এলাম।

আজ আমার স্তাম্বুল হতে বিদায় নেবার পালা। আজ আমাকে পথে নামতে হবে। স্তাম্বুল হতে বিদায় মানে তুর্কী হতে বিদায়। যিনি আমাকে হাত ধরে হোটেলে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি আজ নতুন করে নতুন খাদ্য এনে হাজির করলেন। বললেন, এই হল আমার জাতের আমার দেশের পক্ষ থেকে আপনার জন্য এক দিনের পথের খাদ্য। আপনি পথিক, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন বেঁচে থাকি, আত্মমর্যাদা নিয়ে।

এসব কথার জবাব দিতে সক্ষম হই নি। যা দিয়েছিলেন, বাইসাইকেলের বাক্সে তা পূরে তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মিঃ নিকলাসকে সংগে করে পথে এসে দাঁড়ালাম এবং সর্ব্বপ্রথমই মিঃ নিকলাসকে বললাম, তুরুক জাতের দয়ার কথা ভুলতে পারব না, এরা এগিয়ে যাচ্ছে, এরা এগিয়ে যাবে। মিঃ নিকলাস বাধা দিয়ে বললেন, এদের ভবিষ্যৎ এদের উপর আর নির্ভর করছে না। পন্‌চবর্ষ পরিকল্পনা করে রাশিয়া যেরূপ ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে মনে হয় বলকানের প্রকৃত দণ্ডমুণ্ডের কর্তা রাশিয়াই হবে। তুরুকদের মধ্যেও কমিউনিজম এসে দেখা দিয়েছে, বোধ হয় তা বুঝতে পেরেছেন।

বেশ ভাল করে বুঝেছি, মিঃ নিকলাস। তুরুকদের আর্থিক অবস্থা বোধ হয়

আপনাদের দেশের আর্থিক অবস্থা অপেক্ষা অনেক ভাল। নতুবা আপনাদের দেশকে আপনি বার বার গরিব বলছেন কেন ? তারা বোধ হয় আরও আর্থিক উন্নতি করতে চায়, তাই রাশিয়ার অনুকরণের পক্ষপাতী। মিঃ নিকলাস বললেন "হতে পারে"।

কেলে-স্তাম্বুলের পথে মিঃ নিকলাস প্রায় তিন মাইল পথ আমার সংগে এসেছিলেন। তারপর তিনি বিদায় নিলেন। বন্ধুত্ব গড়ে আর ভাংগে, এই হল পর্যটক-জীবনের একটা মনোবেদনার বিষয়। বিদায় দিতে বাধ্য হলাম। মানুষ যেমন শত কষ্ট সহ্য করেও বাঁচতে চায়, কিন্তু বেঁচে থাকতে পারে না, তেমনি করে আমারও বিদায় নেওয়া।

---

# আদের্নের পথে

আমার সামনে সুন্দর পিচ-দেওয়া পথ। পথের দুদিকে পুরাতন স্তাম্বুল নগরী। ক্রমে নগরী পার হয়ে এলাম। মনে হল এই পুরাতন যেন বিলাপ করছে। নগর পেরিয়ে এসেই কতকগুলি তাঁবু দেখলাম। তাঁবুতে সেপাই বাস করে। তারা সর্বদা সতর্ক দৃষ্টিতে লোকের আসা-যাওয়ার প্রতি কড়া নজর রাখছে। আমি তাদের দৃষ্টিপথে পড়েছিলাম, কিন্তু তারা কিছু বলে নি। আমি তাদের দেশ ছেড়ে চলে যাব, তারা বেশ ভাল করেই জানে। আর ক'মাইল যাবার পরই আবার কতকগুলি সেপাই-এর সংগে দেখা হল। তাদের পথ ছেড়ে দিয়ে পথের পাশে দাঁড়ালাম। তারা প্রত্যেকে আমার দিকে চেয়ে দেখছিল। আমিও তাদের প্রত্যেকের দিকে চেয়েছিলাম। এদের মুখ দেখে মনে হল, দেশের সেবার জন্যই সেপাই সেজেছে, টাকার জন্য নয়। আতা তুরুক ক্ষমতা হাতে নেওয়ার সময় ছিলেন সংখ্যাল্প, কিন্তু এই সংখ্যাল্প দল তাদের দেশের, তাদের জাতের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়েও সেপাই নিযুক্ত করেছিল দেশের মঙ্গলের জন্য, জাতির উন্নতির জন্য। তাই সেপাইরা ছিল জাতির সেবক, পীড়ক নয়।

পথের বাতাস, পথের পাশের সৌন্দর্য আমার মনে বেশ আনন্দ এনে দিয়েছিল। কেতলির জল, সাইকেল-বাক্সের খাদ্য মনে যথেষ্ট স্ফূর্তি এনে দিয়েছিল, তাই চলছিলাম আনন্দের সংগে। কতক্ষণ যাবার পরই দেখলাম সমুদ্রতীরে একটি বৃদ্ধ তুরুক মাছ ভাজা করছে আমাদেরই প্রথামত। সুন্দর গন্ধে সমুদ্রতীর আমোদিত। তার গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে কাছে গেলাম এবং একটি একটি করে মাছ ভাজা খেতে লাগলাম। পয়সা দেবার বেলা আমাকে প্রত্যেকটি ভাজার জন্য দ্বিগুণ দাম দিতে হয়েছিল। লোকটির ধারণা আমাদের দেশের লোক প্রত্যেকেই এক একজন রাজা-মহারাজা, নবাব, নিজাম। এই কথার প্রতিবাদ করেছিলাম, তাতে কাজ হল না, তারই কাছে সেদিনের যে সংবাদপত্র ছিল, তাতে কোন মহারাজার কি এক দানের টাকার উল্লেখ ছিল। মাছ ভাজার পয়সা চুকিয়ে চড়াই ঠেলে চলতে লাগলাম।

বেশীক্ষণ যেতে হল না। নিষিদ্ধ স্থানে এসে পড়ছিলাম। লরি প্রস্তুত

ছিল। আমি যাওয়ামাত্র চটপট করে আমার সাইকেল সুদ্ধ আমাকে বোঝাই করে আদের্নের দিকে লরি রওনা হল। সন্ধ্যার পূর্বে আমরা আদ্রিয়ানোপলে এসে পৌঁছলাম। এখানে হোটেলে যেতে এবং হোটেল খোঁজ করতে পুলিশ মোটেই আমাকে সাহায্য করল না। ভাবলাম, এখানে কএকদিন থেকে নগরীটাকে ভাল করে দেখে নেওয়া চাই।

আদ্রিয়ানোপল পুরাতন নগরী। এই নগরীর বহু ইতিহাস আছে। কিন্তু বর্তমানে ইহা আর নগরী নয়, একটি ছোট শহর বললে দোষ হয় না। এখানে অনেক বড় বড় ইমারত আছে বটে, কিন্তু সবই খালি পড়ে আছে। আদ্রিয়ানোপলের নাম এখন হয়েছে আদের্নে। আদের্নের সব চেয়ে বড় মসজিদটির অবস্থা দেখলে হাসি পায়। আদের্নেতে যত লোক আছে, তাদের সকলকে এখানে পূরে রাখা যেতে পারে। এত বড় মসজিদ হতশ্রী হয়ে পড়ে আছে। একেই বলে কালস্য কুটিলং গতি।

আদের্নে পৌঁছার পরই দেখলাম, জলের কেতলিটাতে একটি ছিদ্র হয়ে গেছে। সাইকেলের প্লেটটাও ক্ষয়ে গেছে। এরূপ শহরে কি করে যে সাইকেল সারাব, তাই ভেবে চিন্তিত হলাম। হোটেলের সামনেই একটি ঔষধের দোকান। দোকানী একটু ইংলিশ বলতে পারেন। তাঁরই কাছে গিয়ে অসুবিধা দুটির কথা বললাম। জলের কেতলি মেরামত হল না, কারণ কেতলিটি এলুমিনিয়াম দিয়ে তৈরী। জলের কেতলির বদলে দোকানী আমাকে একটি সুন্দর বোতল দিলেন জল রাখবার জন্যে। সাইকেল সারাবারও আশ্বাস দিলেন এবং বিকালে কএকজন যুবকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারা আমাকে শহরের নানা স্থানে নিয়ে বেড়াতে লাগল।

আদের্নে দুটি নদীর মোহনায় অবস্থিত। একদিকে নদী পার হলেই গ্রীস, অন্যদিকে নদীর তীর বহু দূরে। গ্রীকদের রাজ্যে প্রবেশ করতে হলেই নানা হাংগামায় পড়তে হয়। আমরা নদীর ওপারে গিয়েও ফিরে এলাম। গ্রীসের অনেকগুলি লোক বিনা পাসপোর্টে নদীর এপারে এসে হোটেলে বসে নানারূপ কথা বলতে লাগল। ওদের ভাষা অনেকটা অবোধ্য। তাদের কথা কান পেতে শুনতে লাগলাম। বিদেশে যাবার জন্য ওদের ভারি উৎসাহ লক্ষ্য করছিলাম। বিদেশে যাবার জন্য তুরুক যুবকগণ মোটেই উৎসাহ প্রদর্শন করে নি। প্রত্যেক যুবক-যুবতী এখন বুঝে নিয়েছে, দেশরক্ষা তাদের সর্বপ্রথম

কাজ। তাই তুরুক যুবকগণ নীরব। গভীর রাত্রে যুবকগণ হোটেলের রুম ভাড়া করে সেখানেই থাকল। পরদিন আবার পূর্ণ উদ্যমে তারা আমাকে নিয়ে পুরাতন নগরীর নানা স্থান বেড়াতে লাগল।

আমাদের দেশের সীমান্তে নানারূপ যুদ্ধের সরম্‌জাম রাখা হয়েছে। আদের্নেতে এসে সেরূপ কিছু দেখতে না পেয়ে ওদের জিগ্‌গাসা করলাম, সেপাই নেই কেন? আদের্নে একটি দুর্গ, তারও কিছু দেখবার নাই—শহরটি যেন পরিত্যক্ত। বর্তমান যুগের আর পূর্বকালের যুদ্ধের প্রকৃতি যে বদলে গেছে, সে কথা আমার মনেই ছিল না। আমার কথা শুনে ওরা হাসল। ইউরোপ যুদ্ধের জন্য যে নূতন উপকরণ তৈরী করছে, পুরাতন যুগের দুর্গ, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত কিছুই তার পথ আগলে রাখতে পারে না বলেই আদের্নে খালি পড়ে আছে। যুদ্ধ করতে চাও, আদের্নে নিয়ে যাও, কিন্তু তার ফলে হয়তো তোমার দেশের স্বাধীনতা হারাবে, এই হল তুর্কীর একের নম্বরের হুমকী।

কোথা হতে আসে সেই হুমকী? তুর্কীর সেরূপ হুমকী দেবার ক্ষমতা আছে যারা বলে, তারা তুর্কীকে মোটেই জানে না, তারা অন্ধকারে পড়ে আছে। তুর্কী যার সংগে যে কোনরূপে মিত্রতা করুক, সেই মিত্রতাকে শুধু প্যাক্টই বলা যেতে পারে। প্যাক্ট বন্ধুত্ব নয়, সাময়িক শত্রুতা হতে বিরত থাকা মাত্র। বুঝলাম, তুর্কী প্যাক্ট করে নি, বন্ধুত্ব করেছে, সেই বন্ধুত্ব গলবস্ত্র হয়ে নয়।

সাইকেলের প্লেটটা বদলি হল, আমার যা দরকার তা নেওয়া হল। তারপর চললাম তুর্কীর সীমান্তের দিকে। পথে কাস্টমস্ অফিসার হতে সাত লিরা চেয়ে নিলাম। তিনি আমার কাছে কোন কথা জিগ্‌গাসা করলেন না। শুধু বললেন, যা সংগ্রহ করেছেন, তা নিয়ে যান। তুরুক জাত পর্যটকের পাথেয়তে ভাগ বসাবে না।

সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। কতকক্ষণ পরেই তুরুক সীমান্ত সমাপ্ত হবে। সামনে পেছনে দক্ষিণে বামে চারদিকে যবের ক্ষেত্র। কোথাও পেকেছে, কোথাও পাকে নি। কোথাও কলের কাস্তে দিয়ে যব কাটা হচ্ছে, কোথাও কৃষক আনমনে চেয়ে আছে। আমি সাইকেল হতে নেমে সে দৃশ্য অনেকক্ষণ দেখলাম। অগ্‌গাত কারণে একটা বুকভাংগা দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে এল পরিচিতের মায়া কাটিয়ে অপরিচিত বুলগেরিয়া সীমান্তে প্রবেশ করলাম। ত নতুন দেশের আকর্ষণ আছে। সাময়িকভাবে তুর্কীর স্মৃতি মন থেকে সরে গেল।

বুলগেরিয়া সবটুকু মন জুড়ে রইল। তুর্কী এখন আমার কাছে পুরাতন, বুলগেরিয়া নতুন। নতুন যুগের নতুন তুর্কী পেছনে পড়ে রইল। সামনে বুলগেরিয়ার সীমান্ত—যে দেশ সনাতন রক্ষণশীলতাকে হটিয়ে দিয়ে প্রগতিশীল রুশিয়ার সংগে পা ফেলে চলবার চেষ্টা করছে।